ইউনিট
৪

প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড ঃ কৃষি

প্রায় ৭ বিলিয়ন লোক অধ্যুষিত বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে এক বা একাধিক ধরণের আর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে জড়িত এবং কর্মীদের সংখ্যানুপাতে কৃষিই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাধিক পরিচিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যে খাতে প্রায় ৭৫ ভাগেরই বেশি লোক পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। অত্র ইউনিটে মোট ৫টি পাঠ রয়েছে, যা নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা হলোঃ

পাঠ- ৪.১ ঃ কৃষিকাজ- সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ কৃষির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ☞ কৃষির বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

কৃষির সংজ্ঞা ঃ মানুষের আর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রথম স্তর হচ্ছে কৃষি- যা চাষবাস সহ পশুপালন, বনায়ন, ফলমূল সংগ্রহ, মৎস্য চাষ ও উৎপাদন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ্যাগার (Ager) এবং কালচার (Culture) নামক দুটি ল্যাটিন শব্দ থেকে ইংরেজী Agriculture শব্দটি এসেছে যার আভিধানিক অর্থ ভূমি কর্ষণ অর্থাৎ ভূমি কর্ষণের মাধ্যমে শস্যাদি উৎপাদন বা উত্তোলন কে বুঝায়। সাধারণভাবে নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে কৃষির উৎপত্তি ঘটেছে, যেমন-

* খাদ্য সংগ্রহ (জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন একক বা জনগোষ্ঠীর দৈহিক চাহিদার তাগিদে ফল-মূল সংগ্রহসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের শুরু),
* পশু শিকার (প্রাথমিক দিকে বন জঙ্গল থেকে ছোট থেকে বড় ধরণের প্রাণী শিকার ও আহার)
* পশু পালন (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উদ্ধৃত্ত প্রজন্মের জন্য স্থায়ীভাবে নানা রকম পশু পালন প্রক্রিয়া শুরু হয়)

কৃষি (স্থায়ীভাবে পরবর্তীতে উপস্থিত নানা রকম পরিবেশ অনুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রতিপালনই স্থিতিশীল হয়)। তবে বর্তমানে এর পরিধি ও কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল।

অর্থাৎ শস্যাদি উৎপাদন করে ও পশুসমূহ পালন করে এবং এ সকল উৎপাদনকে মানুষের ব্যবহার ও বিক্রি বিপনণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদির জন্য মৃত্তিকা কর্ষণের কলাকৌশল বা বিজ্ঞানই কৃষি (ইসলাম)। ম্যাককার্টি ও লিপ্তবার্গ নাম্নীয় দুজন মার্কিন ভূগোলবিদ উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন শস্য উৎপাদন ও গবাদি পশুপালন কর্মকান্ডকে কৃষি নামে অভিহিত করেছেন (তাহা)। অপরদিকে জিম্যারম্যান নামীয় ভূগোলবিদ উল্লেখ করেন যে, "কৃষি হচ্ছে মানুষের ঐ সকল উৎপাদনশীল প্রচেষ্টা, যাতে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করে ভূমির নানাবিধ ব্যবহার অন্বেষণ করে এবং সম্ভব হলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও উন্নয়ন ঘটায় অথবা নিজেদের চাহিদা মাফিক উদ্ভিদ ও প্রাণী স্বাভাবিক জন্ম বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় শস্য ও প্রাণীজ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা।" অর্থাৎ কৃষি হচ্ছে একটি মানবীয় কর্মকান্ড যা পরিকল্পিতভাবে ভূমি বা মৃত্তিকা ও পানিতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঘটায় এবং খাদ্য ও বস্ত্রাদির মত মৌলিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। তবে আধুনিক কালে কৃষিকার্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক জন্ম বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় বনায়ন ও তার সংরক্ষণ, মাছ চাষ ও পালন, পশুপালন সহ দ্রব্যাদির উৎপাদন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকে। অতীতে কৃষিই একচেটিয়া বা একমাত্র উপজীবিকার মাধ্যম থাকলেও বর্তমানে তা আর নেই। মূলতঃ জলবায়ু ও মৃত্তিকার পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং উন্নতির ও তারতম্য ঘটে থাকে।

বৈশিষ্ট্য ঃ উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, কৃষি একটি একক স্বত্বাবিশিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যাতে অনেক ধরণের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় বিদ্যমান। নিম্নে এ ধরণের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-

১. মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে কৃষি আদিম ও প্রথম পর্যায়ভূক্ত।
২. কৃষিকার্যে নিয়োজিত লোকজন কৃষক নামে অভিহিত।
৩. বর্তমান কালেও কৃষি মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উপজীবিকা এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ লোক কৃষিকার্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ কৃষিকার্যে পৃথিবীর অধিক সংখ্যক লোক নিয়োজিত।
৪. পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, সমাজ, মানব গোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং আজ অবধি এর বিকল্প অন্য কোন আর্থনৈতিক কর্মকান্ড এর স্থান দখল করতে সক্ষম হয়নি।
৫. খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনে কৃষির কোন বিকল্প নেই।
৬. কৃষিকার্যের মৌল একক হচ্ছে খামার এবং এ খামার আকারে ছোট (মাত্র .১) থেকে বড় (যেমন ১০০ একর বা তার উর্ধ্বে) হতে পারে।
৭. কৃষির মূল ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নৈসর্গিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর জন্য শস্য উৎপাদনসহ ঐ জাতীয় অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ, শিকার এবং উৎপাদনের কলা কৌশল।
৮. কৃষিই একমাত্র আর্থনৈতিক কর্মকান্ড যার বিস্তৃতি পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র এবং সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে।
৯. কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অন্যান্য কর্মকান্ড দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য থেকে অনেক বেশি।
১০. কৃষিকার্যে প্রকৃতির একচ্ছত্র প্রভাব বা আধিপাত্য বিদ্যমান। আবার প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারে মানুষের প্রচেষ্টা কৃষিতে উপস্থিত।
১১. কৃষিই মানুষকে ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহ/তাগিদ প্রদান করেছে এবং পৃথিবীর প্রথম বসতিসহ সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছে কৃষিই।
১২. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্যের কারণে কৃষির ধরন, পদ্ধতি ও উৎপাদনের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন আদিম কৃষি, জীবন নির্বাহী কৃষি, প্রগাঢ় কৃষি, বাগান কৃষি, বাণিজ্য কৃষি, শুষ্ক কৃষি, আর্দ্র কৃষি, সেচ কৃষি ইত্যাদি।
১৩. কৃষিকার্যে ছোট ও বড় ধরণের উৎপাদন এককের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আবার এক একক থেকে বহুবিধ পণ্য উৎপাদন কৃষিতে উপস্থিত (তাহা)।
১৪. কৃষিকার্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জৈব ধারা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত।
১৫. কৃষিকার্যে আত্মনির্ভরশীল উৎপাদনের বিশেষ অস্তিত্ব বিদ্যমান।
১৬. কৃষিই একমাত্র কর্মকান্ড যা বহু শিল্পের কাঁচামালের যোগানদার হিসেবে পরিচিত (যেমন, আখ, বিট-চিনি শিল্প, চা শিল্প, তুলা, পশম দ্বারা বস্ত্র শিল্প, বিভিন্ন বৃক্ষ, ঘাস, বাঁশ, ছোবড়া দ্বারা কাগজ ও মন্ড শিল্প, মশলা, সয়াবিন, দুধের ক্যাসেইন দ্বারা রঞ্জক শিল্প, গবাদি পশুর গ্রন্থি, ভেষজ দ্বারা ঔষধ শিল্প, সরিষা, রাই ইত্যাদি দ্বারা তৈল শিল্প ইত্যাদি)।
১৭. কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের পরিচর্যা মূলক শিল্পের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে (যেমন, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষির উপর নির্ভরশীল)।
১৮. কৃষির উপর নির্ভরশীল অঞ্চল অন্যান্যে কর্মকান্ডের চেয়ে বেশি এবং সাধারণতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অনুন্নত।
১৯. উন্নয়নশীল সমাজে প্রায় সকল কর্মকান্ডই কৃষির উপর নির্ভরশীল।
২০. কৃষিকার্যে ভূমির প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।
২১. কৃষিকার্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হতে পারে।
২২. প্রতিনিয়ত চাষাবাসে কৃষি ভূমির ক্ষয়, উর্বরতা হ্রাস, কীটনাশক ব্যবহার, সার প্রয়োগ, পানি সেচ ও রক্ষণাবেক্ষণ জনিত সমস্যা বিদ্যমান থাকে।
২৩. সাময়িক বিচারে কৃষিকার্যে আয়ের মাত্রা যথেষ্ট নয়।
২৪. সাধারণভাবে কৃষিকার্য বিশেষ উৎসাহব্যাঞ্জক নয়।
২৫. কৃষিই একমাত্র খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে।
২৬. প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুন কৃষিকার্য (ক) খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলে স্থানান্তর ঘটে; খ) শস্যাদি উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটে; গ) সেচ কার্য বৃদ্ধির চাহিদা ঘটে এবং ঘ) শুষ্ক অঞ্চলে ক্ষতিকর বস্তুর দরুন শস্যাদির নানারকম রোগ ব্যাধি এবং আগাছা বৃদ্ধি ঘটে।

প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) _____ হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাধিক _____ অর্থনৈতিক _____ ।
খ) মৃত্তিকা _____ কলাকৌশল বা বিজ্ঞানই _____ ।
গ) খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন _____কোন বিকল্প নেই।
ঘ) উন্নয়নশীল _____ প্রায় সকল কর্মকান্ডই _____ উপর নির্ভরশীল।
ঙ) কৃষিই একমাত্র খাদ্য _____ ও সরবরাহ _____ সচল রাখে।

উত্তরঃ ক. কৃষিই, পরিচিত, কর্মকান্ড খ. কর্ষণের, কৃষি গ. কৃষির ঘ. সমাজে ঙ. উৎপাদন, প্রক্রিয়াকে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. কৃষি কি?
খ. কৃষির আভিধানিক অর্থ কি?
গ. কৃষির ১০ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর
ঘ. জিম্যারম্যানের কৃষির সংজ্ঞাটি লিখ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কৃষির সংজ্ঞা লিখ এবং ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা কর।

পাঠ- ৪.২ ঃ কৃষি নিয়ন্ত্রণকারী ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ কৃষি নিয়ন্ত্রণকারী ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

কৃষিকার্যের উপর নানাবিধ উপাদান বা নিয়ামকের প্রভাব পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর প্রভাব এককভাবে বিবেচনা না করে সামগ্রীক ভাবে বিবেচনা করা হয়। কেননা এগুলো একটির অবর্তমানে অন্যটির কার্যকারিতা সহজেই পৃথক করা যায় না বা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে সেগুলোকে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক এ দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রকৃতিগত উপাদান যেমন জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ইত্যাদি যাদের প্রভাব সম্মিলিতভাবে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে তাদেরকে প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক নিয়ামক বলা হয়। অপর পক্ষে যেসব নিয়ামক প্রকৃতিগত নয়, যেমন, অর্থ যোগান, বাজারজাতকরণ, শ্রমিক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বীজ, সার-কীটনাশক, যন্ত্রপাতি, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নীতি ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ইত্যাদি যাদের প্রভাব অনেক খানি অর্থের উপর নির্ভরশীল এবং কৃষিকেও নির্ভরশীল করে তোলে বা ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে থাকে।

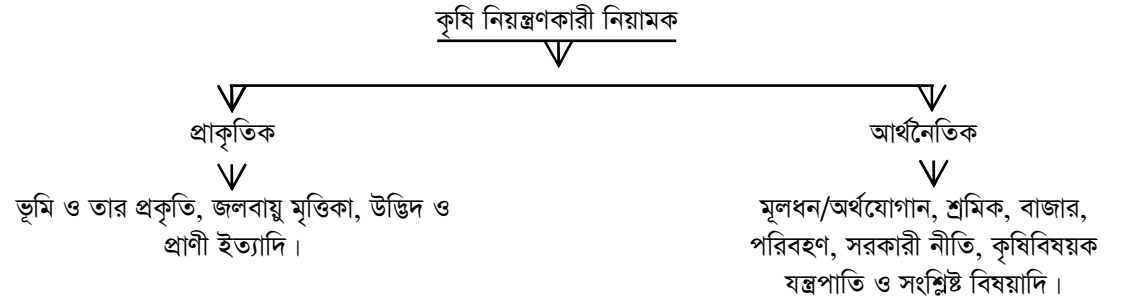

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক নিয়ামক ঃ ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূ-প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি এবং বলতে গেলে কৃষির সাফল্য বা উন্নতি ও অবনতির নিয়ন্ত্রণকারী। তবে সুখবর যে এদের সবাই স্থায়ী প্রকৃতির নয়। নিম্নে এ সবের বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করা হলোঃ

জলবায়ু ঃ আমরা জানি যে, কোন স্থানের বেশ কয়েক বছরের (২০ বছর বা তার বেশি) আবহাওয়াগত গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয় এবং কৃষিকার্যে এর নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি। জলবায়ুর মধ্যে তাপমাত্রা বা উত্তাপ (যেমন শস্য ফলানোর সময়, ফসল উত্তোলনের সময়, চাষাবাসের সময়, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্য গত পার্থক্য, অধিক উষ্ণতা ও অধিক শৈত্যতা ইত্যাদি), আর্দ্রতা (বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বাষ্পীভবনের হার ও পরিমাণ, ভূগর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকার পানির পরিমাণ ও হার ইত্যাদি), বৃষ্টিপাত (বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি, বিস্তার, পরিমাণ ও ধরন), সূর্যেরশ্মির তেজ ও পরিমাণ (লম্বভাবে কিংবা তির্যকভাবে পতিত রশ্মি, দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি), বাতাস ও তার সংমিশ্রণ (বাতাসের গতি, শক্তি, স্থায়িত্ব, ও ক্ষতিকর প্রভাব, ক্লোরিন,কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের উপস্থিতি) ইত্যাদির দৈনন্দিন, ঋতুভিত্তিক অথবা বাৎসরিক তারতম্যের প্রভাব শস্যের ফলনের ব্যাপক তারতম্যসহ কৃষির নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে এখনও অটল।

কৃষির ধরন (আর্দ্র বা শুষ্ক), শস্যের প্রকৃতি (খাদ্যশস্য- গম বা ধান), চাষাবাদের সময়কাল (ঋতুগত-শীত বা গ্রীষ্ম), ইত্যাদি তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে বা উপরে চাষাবাদ সম্ভব নয়। উষ্ণ মরু এবং শীতল তুন্দ্রা ভূমিতে চাষাবাদ প্রায় অসম্ভব। অনেক উদ্ভিদ গজায় সূর্য্য কিরণের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে। আবার তুষার মুক্ত এলাকা তুলা গম ও অন্যান্য কৃষিজ ফসলের চাষাবাদে উপযুক্ত। কৃষির প্রতিটি ফসলের কম, গড় ও বেশি তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তা জীবনের প্রতিটি স্তরেই সমভাবে কার্যকরী। শীতকালীন রাই এর জন্য তাপমাত্রা তুলনামূলক কম চাহিদা এবং শীত সম্পৃক্ত ঠান্ডা বরফপাত ও সহ্য করার ক্ষমতা বিদ্যমান। ক্রান্তীয় শস্যাদির (যেমন খেজুর, কোকো গাছ, বরবটি গাছ) জন্য সারা বছর উচ্চ শুষ্কতা প্রয়োজন। রাত্রের তাপমাত্রার প্রভাব বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিছু কিছু শস্য (যেমন- আলু-বীট) সাধারণতঃ রাত্রিকালীন ঠান্ডায় দ্রুতভাবে কার্বোহাইড্রেট সংরক্ষণ করতে পারে। তুলা, ভুট্টা এবং তামাকের বিকাশে গরম রাত্রির প্রয়োজেন। উষ্ণ জলবায়ুর উত্তপ্ত তাপমাত্রা এর অঙ্করোদগমকে ধ্বংস করে দেয়। আবার শীতল দেশের উষ্ণতা বীটের উপকার করে থাকে। পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতার ফলস্বরূপ খাদ্যশস্য সরবরাহ পদ্ধতি বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে।

বৃষ্টিপাতের ধরন ও পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়, কোথাও পরিচলন, কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও বা শৈলোৎক্ষেপ ধরণের বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এদের তারতম্যের কারণে কৃষির ধরন ও ফসল উৎপাদনের তারতম্য ঘটে থাকে। উচ্চ অক্ষাংশের অনেক দেশ নিম্ন অক্ষাংশের দেশসমূহের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত প্রায় ১৫% গ্রহণ করে থাকে।

বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের সঙ্গে পোকামাকড় ও নানারকম রোগব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়। অনেক সময় মরিচা ও কুয়াশাজনিত রোগব্যাধি, মৃত্তিকা বাহিত অসুখ বিসুখ, গরম, বৃষ্টি বহুল, আর্দ্র অবস্থায় কর্মক্ষমতা/সচেতনতা বেড়ে যায়। আবার কোনো কোনো পোকামাকড় (যেমন ছিঁছিঁ মশা) রক্তপায়ী কীট, মাইটস ইত্যাদির কার্যক্রমও সংখ্যা বৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটে। উষ্ণ পূর্ব-বসন্তে ভাল অংকুরোদগম প্রতিষ্ঠিত হয় আবার উষ্ণ গ্রীষ্ম ও উষ্ণ হেমন্তে শস্যাদিকে পাক ধারাকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে থাকে।

কৃষিতে আর্দ্রতা- বৃষ্টিপাতরূপে অথবা অন্য কোন উৎস থেকে আগত-প্রকৃতি, ধরন ও বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যেমন, ধান উৎপন্ন হয় আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে। আর গম তুলনামূলক উষ্ণ, কম বৃষ্টিপাত অঞ্চল পছন্দ করে। আর্দ্র অঞ্চলে ভিজা ও সেচকৃত কৃষি প্রচলিত আর শুষ্ক-আর্দ্র শুষ্ক অঞ্চলে শুষ্ক ধরণের কৃষিকার্যের উপযুক্ত। বিশেষ বিশেষ ফসল বিশেষ বিশেষ ধরণের জলবায়ু অঞ্চুলের জন্য খুবই উপযোগী। যেমন, নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে রবার, ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ইক্ষু, শুস্ক প্রায় জলবায়ুতে খেজুর, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পাটের চাষ হয়ে থাকে।

উদ্ভিদের উপর সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ব্যতিক্রম তাপমাত্রা সংক্ষিপ্ত কালীন সময়ে উৎপাদন নির্দিষ্ট পর্যায়ের সহিত এক হয়ে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে শস্যের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

মৃত্তিকা ঃ কৃষি নিয়ন্ত্রণকারী ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুণ ও সংশ্লিষ্ট মিশ্রণ, মৃত্তিকা গঠন কাঠামো, গঠন, ছিদ্রময়তা, প্রবেশ্যতা, অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব ইত্যাদি কৃষি উৎপাদন ও চাষাবাদ সীমানা নির্ধারক হিসেবে পরিচিত এবং গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেননা এ গুলো সম্মিলিতভাবে উদ্ভিদের খাদ্যদ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং মৃত্তিকার উষ্ণতা, পানি ধারণ ক্ষমতা ও জৈব ও অজৈব ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে পরিগণিত এবং পরিনামে বিকাশ ও পরিবৃদ্ধ সহায়ক। এটা সবারই জানা যে, মৃত্তিকা সর্বত্র একই রকম নয় এবং বিভিন্নতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার এটাও সবারই জানা যে, উর্বর মৃত্তিকা কৃষির জন্য উপযোগী এবং অনুর্বর ভূমি কৃষির জন্য অনুপযোগী। সাধারণতঃ নদী বাহিত পলি মৃত্তিকাতে ধান চাষ, কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গম চাষ, চুন মিশ্রিত মৃত্তিকায় তুলা, চুন ও পটাশ মিশ্রিত মৃত্তিকায় ইক্ষু, আর পাহাড়ী মৃত্তিকায় ঝুম ও চা, রাবার চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

ভূ-প্রকৃতি ঃ কৃষিকার্যের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে ভূ-প্রকৃতি যাতে ভূমির অবস্থান, উচ্চতা, অসমতা/বন্ধুরতা, ঢাল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। খাড়া ঢাল, উচ্চ ভূমি, অসম প্রকৃতির ভূ-পৃষ্ঠ কৃষির জন্য অনুপযোগী কেননা খাড়া ঢাল পানি বহন করে, উচ্চ ভূমি তাপমাত্রা হ্রাস এবং অসম ভূ-প্রকৃতি কৃষি যন্ত্রপাতি কর্মসূচীকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে।

নিম্ন অথচ সমতল ভূমি ধান, পাট এবং তুলনামূলকভাবে উচু ও ঢাল বিশিষ্ট পাহাড়ী ভূমি কফি, চা, রবার ইত্যাদি চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. জলবায়ু, _____, ভূ-প্রকৃতি, _____ ও জীবজন্তুর _____ সবচেয়ে বেশি।
২. কৃষি কার্য্যে _____ নিয়ন্ত্রণ _____ বেশি।
৩. নির্দিষ্ট _____ সঙ্গে সঙ্গতি _____ করে শস্যের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

উত্তরঃ ১. মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, নিয়ন্ত্রণ ২. জলবায়ুর, সবচেয়ে ৩. পরিবেশের, স্থাপন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষি নিয়ন্ত্রণে ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ কি কি?
২. কৃষি নিয়ন্ত্রণে জলবায়ুরর ভূমিকা উল্লেখ কর।
৩. মৃত্তিকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কৃষিতে কতটুকু প্রভাব ফেলে তা আলোচনা কর।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কৃষি নিয়ন্ত্রণকারী ভৌগোলিক নিয়ামকসমূহ বর্ণনা কর।

পাঠ- ৪.৩ ঃ বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতি এবং বন্টন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ কৃষি পদ্ধতি ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বণ্টন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

কৃষি পদ্ধতি ও তার শ্রেণীবিভাগ ঃ আমরা জানি যে কৃষি একটি জটিল ধরণের আর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং স্থান ও সময়ের ব্যবধানের সাথে সাথে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। আবার এটাও জানি যে, কৃষির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপনে বিভিন্ন নিয়ামক যেমন ভূমি, আর্দ্রতা, ঋতুভেদ, জলবায়ু, উৎপাদন ব্যবস্থা, আঞ্চলিক তারতম্য ইত্যাদি সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সকল নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে কৃষি পদ্ধতিরও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বিভিন্নতার ভিত্তিতে কৃষির শ্রেণীবিভাগ ও তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

কৃষির বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগঃ

ক) ভূমির প্রাপ্যতার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে

১. প্রগাঢ়/নিবিড় কৃষি পদ্ধতি এবং
২. ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি।

খ) ভূমির আর্দ্রতা ও পানি প্রাপ্যতার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে

১. আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি;
২. শুস্ক কৃষি পদ্ধতি এবং
৩. সেচ কৃষি পদ্ধতি।

গ) ভূমির মালিকানার তারতম্যের ভিত্তিতে

১. রাষ্ট্রীয় খামার পদ্ধতি;
২. যৌথ খামার পদ্ধতি এবং
৩. ব্যক্তিগত খামার পদ্ধতি

ঘ) শস্য পদ্ধতির তারতম্যের ভিত্তিতে

১. একক বা এক ফসলী কৃষি পদ্ধতি;
২. দ্বৈত বা দো-ফসলী কৃষি পদ্ধতি এবং
৩. বহুত্ব বা বহু ফসলী কৃষি পদ্ধতি।

ঙ) ঋতুভেদের তারতম্যের ভিত্তিতে

১. খারিপ কৃষি পদ্ধতি এবং
২. রবি কৃষি পদ্ধতি।

চ) সামাজিক ব্যবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে

১. ধণতান্ত্রিক /ধনিক কৃষি পদ্ধতি;
২. সামন্ততান্ত্রিক/সামন্ত কৃষি পদ্ধতি এবং
৩. সমাজতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি।

ছ) ভৌগোলিক অঞ্চলের তারতম্যের ভিত্তিতে

১. মৌসুমী কৃষি পদ্ধতি;
২. ভূ-মধ্যসাগরীয় কৃষি পদ্ধতি;
৩. উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় মিশ্র কৃষি পদ্ধতি এবং
৪. ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বাগান কৃষি পদ্ধতি।

জ) ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের তারতম্যের ভিত্তিতে

১. আদিম জীবিকা নির্বাহী কৃষি পদ্ধতি;
   - স্থানান্তর/প্রচরণশীল/দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষি পদ্ধতি
   - স্থায়ী পর্যায়ের কৃষি পদ্ধতি

২. বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি;
৩. আবাদী/বাগিচা কৃষি পদ্ধতি;
৪. শস্যাবর্তন কৃষি পদ্ধতি এবং
৫. ইন্টারকালচার কৃষি পদ্ধতি।

ঝ) প্রাকৃতিক ও আর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের ভিত্তিতে

১. স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি পদ্ধতি/জীবিকা নির্বাহী কৃষি পদ্ধতি;
২. এক ফসলী বাজার ভিত্তিক ও বাগিচা কৃষি পদ্ধতি এবং
৩. মিশ্র বা বহুমুখী কৃষি পদ্ধতি।

ঞ) ফসল ও লাইফষ্টক, ভূমি ব্যবহারের নিবিড়তা, কৃষিজাত পণ্যাদির প্রক্রিয়াজতকরণ, খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রভৃতি মাত্রা ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়ামক ও অন্যান্য কাঠামোর প্রকারভেদ এর উপর ভিত্তি হুইটলেসী প্রদত্ত কৃষি পদ্ধতি

১. যাযাবরীয় পশুপালন;
২. লাইফস্টক র‍্যাঞ্চিং;
৩. স্থানান্তরী কৃষি;
৪. আদিম স্থিতিশীল ভূমিকর্ষণ;
৫. ধান প্রধান নিবিড় স্বয়ং ভোগী কৃষি পদ্ধতি;
৬. জলাভূমির ধানবিহীন নিবিড় স্বয়ং ভোগী কৃষি;
৭. বাণিজ্যিক উপনিবিষ্ট কৃষি;
৮. ভূ-মধ্যসাগরীয় কৃষি;
৯. বাণিজ্যিক কৃষি;
১০. বাণিজ্যিক পশুপালন ও শস্য চাষ;
১১. স্বয়ং ভোগী পশুপালন ও শস্য চাষ;
১২. বাণিজ্যিক গঞ্জশালার পশুপালন এবং
১৩. বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উদ্যান কৃষি।

কৃষি পদ্ধতি

বন্টন ঃ উপরোক্ত কৃষি পদ্ধতিসমূহের বিশ্বব্যাপী বিস্তরণগত বৈশিষ্ট্যসহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১) প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতি (Intensive farming)

পৃথিবীর প্রায় ৬ বিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ১/৩শ প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল এবং এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিয়োজিত লোকসংখ্যার ভিত্তিতে এটিই পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ একটি আর্থনৈতিক কর্মকান্ড।

প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতিতে ভূমির প্রতিটি এককের সর্বোচ্চ ব্যবহার বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ জমির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ফসল ফলাইবার পদ্ধতিই হলো প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতি। পৃথিবীর ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলসমূহে এ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রচলিত; যেমন (১) দঃ পূর্ব এশিয়ার চীন, ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড; (২) পুর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি। তাছাড়া নীল নদ ও টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদী উপত্যাকা অঞ্চলসহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ, যেমন- নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইতালীতে এই পদ্ধতি অবলম্বনে চাষাবাদ হয়ে থাকে।

বৈশিষ্ট্য

১) এ ধরণের কৃষিতে শস্যের উপর বেশি জোর দেয়া হয় এবং বিভিন্ন প্রকার শস্যের মধ্যে খাদ্য শস্য বিশেষ করে ধান সর্বত্র বিরাজমান। খাদ্যশস্য ছাড়া তুলা ও রেশম চাষ হয়ে থাকে। যেখানে ধান চাষ হয় না সেখানে গম, বার্লি, যব, নানা ধরণের সবজি, তরমুজ, ফলমূল, ইক্ষু ইত্যাদি প্রচুর জন্মে।
২) এ পদ্ধতির কৃষিতে মানব শ্রম ও আদিম ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি বেশি ব্যবহৃত হয়। যার ফলে একে অনেকে Hoe সংস্কৃতির অঞ্চল বলে থাকে।
৩) এ ধরণের কৃষিতে শস্য পদ্ধতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় । যেমন- আন্তঃ কৃষি ও বহুবিধ কৃষি।
৪) এ কৃষিতে খামার আকৃতিগুলো খুবই ক্ষুদ্র ধরনের।
৫) এ কৃষি পদ্ধতিতে প্রতি একক ভূমিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন প্রচেষ্টা বিদ্যমান।
৬) এ পদ্ধতিতে মাথাপিছু উৎপাদন কম হয়।
৭) এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি মৌসুমী জলবায়ু নদী বিধৌত উর্বর মৃত্তিকার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। আবার খরা ও বন্যা দ্বারা এ সকল কৃষি পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৮) এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসলাদির খুব কমই বাজারে যেতে পারে।
৯) বহুবিধ শস্য চাষ এ পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়।
১০) চাষাবাদ নিমিত্তে ভূমি তৈরি, শস্য উত্তোলন, নিড়ানী ইত্যাদি মানব শ্রমের উপর নির্ভরশীল এবং চিরায়ত লাঙ্গল ও পশু এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
১১) আধুনিক প্রযুক্তির অভাব খুব পরিস্কার ভাবে এ পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত হয়।
১২) এ ধরণের পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও সংগ্রহ বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে।
১৩) প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে তাপমাত্রার কম সমস্বত্ব বজায় থাকে।
১৪) প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতির অঞ্চলগুলোর অভ্যন্তরে বৃষ্টিপাতের ব্যাপক তারতম্য ঘটে। যেমন সবচেয়ে বেশী ৮০// (ভারতীয় উপমহাদেশে) এবং সবচেয়ে কম দেখা যায় উত্তর চীন অঞ্চলে (২০// এর কম)। ফলে স্পষ্টভাবে তিনটি অঞ্চল দৃশ্যমান হয়, যেমন-
   - সবচেয়ে আর্দ্র অঞ্চল ৮০// এর বেশি বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্র ধান সেখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
   - শুস্ক অঞ্চল ৫০//- ৮০// বৃষ্টিপাত এবং সেখানে শুস্ক ধান চাষ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।
   - শুস্কতম অঞ্চল- বৃষ্টিপাত ৫০// এর নীচে এবং এখানে নিম্ন সীমানায় ধান এবং উচ্চ সীমানায় গম চাষে নিয়োজিত থাকে।
১৫) এ কৃষি পদ্ধতিতে কর্ষণযোগ্য/চাষযোগ্য জমির আয়তন জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম।
১৬) এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে কৃষিজ দ্রব্যের বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের চাহিদা খুব বেশি।
১৭) স্বল্প কৃষিজমিতে বেশি পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের তাগিদে বারে বারে বেশি শ্রমিমেকর জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
১৮) এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে ধান প্রধান উৎপন্ন শস্য।
১৯) এ পদ্ধতিতে অনাবাদী জমির বিলুপ্তি ঘটে এবং সার ও অন্যান্য জিনিসের বেশি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।
২০) সাধারণতঃ নিম্নভূমিতে এ ধরণের কৃষিকার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় পাহাড়ের ঢালু জমিতেও এটা পরিলক্ষিত।
২১) এ ধরণের কৃষিকাজে মাঝারী ধরণের মৃত্তিকা উপযোগী যাতে প্রচুর দ্রবীভূত উদ্ভিদ খাদ্য বজায় থাকে এবং সাধারণতঃ মৃত্তিকার উপর সঞ্চিত পলল মৃত্তিকা এর জন্য বিশেষ উপযোগী।
২২) মানুষ ভূমি অনুপাতে অর্থাৎ জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ খুবই কম এবং মৃত্তিকা ও অঞ্চলভেদে বেশ তারতম্য বিদ্যমান। যেমন- ভারতে ০.৯ একর চাষাযোগ্য ভূমি প্রতিজন, চীনে ০.৩ একর, জাপানে ০.১ একর। আবার উৎপাদনের অনুপাতেও বেশ তারতম্য দেখা যায়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর মধ্যে এ অঞ্চল দুর্ভিক্ষ প্রবণ অঞ্চল। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন প্রতিজন লোকের জন্য গড়ে ২১০০ ক্যালোরীর প্রয়োজন অথচ সর্বত্র বিশেষ করে ভারতে মাত্র ১৯০০ ক্যালোরী বিদ্যমান।
২৩) এ অঞ্চল পৃথিবীর আদিমতম বসতিপূর্ণ এলাকা আর যেহেতু কৃষিকাজ কমপক্ষে ৪০০০ বছরের পুরাতন, সুতরাং শতাব্দী ধরে তারা উন্নত সংস্কৃতিবান। তারা ভাষা ও লিখনের দিকেও ইউরোপ আমেরিকা ও গ্রীসের চেয়েও উন্নত অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকা যখন অধ-পৈশাচিকতায় মগ্ন, তখন এ অঞ্চলের লোকজন ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় উন্নত ছিল। তবে দুঃখের বিষয় আজ আবার এরাই বেশি অশিক্ষিত পৃথিবীর বুকে। (প্রায় ৮০% লোক অশিক্ষিত)।
২৪) মৃত্তিকা বিজ্ঞান অনুশীলনে দেখা যায় যে, এককালে এ অঞ্চলের কৃষকরা বেশ উন্নত ছিল। তারা জানতো যে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে মৃত্তিকা থেকে এবং মানুষ সে গুলোকে সরবরাহ করে। অর্থাৎ গাঢ় চক্র যেটি উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানবের বিভিন্ন বর্জ্য থেকে মৃত্তিকায় ফিরে এসে সে পুষ্টিপূরণ করতো। গাছপালা থেকে সবুজ সার, মানুষের প্রস্রাব, পায়খানা, যাতে থাকে বেশ পরিমাণে দ্রবীভূত পটাশ, ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং অনেক অদ্রবীভূত পদার্থের সংমিশ্রণ এবং নাইট সয়েল (মানব বর্জ্য)।
২৫) সত্যি বলতে কি পৃথিবীর সবগুলো ধর্মের উৎপত্তি এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে।
২৬) এ ধরণের অঞ্চলে এক বিশেষ ধরণের গ্রামীণ বসতি বিন্যাসের উদ্ভব ঘটেছে যেখানে গ্রামীণ বহুত লোক দলভিত্তিক কৃষিভূমির পার্শ্বে পুঞ্জীভূত হয়ে বসতি স্থাপন করে এবং ভূমিরূপ কে করে তোলে এক অপরূপ শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ যা বর্তমানের আমেরিকাতেও অনুপস্থিত। একে প্রাচ্য বার্মার গ্রাম পদ্ধতি বলা হয়- এবং এতে অর্থনৈতিক (প্রয়োজনীয় রেশন কাড, অসুখ, দুর্ভিক্ষ মুকাবিলা ঋণ) ও সমাজতাত্ত্বিক উপাদান নিহিত। পরিবারের আনুগত্য ও শিষ্টাচার শিখে।
২৭) দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থার সঙ্গে এ পদ্ধতি সংস্পৃক্ত, যেখানে কমই পাকা রাস্তা বাড়ী ঘর রয়েছে আর প্রাধান্য রয়েছে ফুটপাত কাচা রাস্তার।
২৮) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে এখানে অনুপস্থিত, রাজনৈতিক চিন্তা ধারণার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বেশ মিল এবং পৃথিবীর মানুষ স্থানান্তর ইতিহাসে এ অঞ্চলের লোকজন বেশি স্থানান্তর ঘটেছে।

ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি

পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে মাথাপিছু শস্য উৎপাদন সর্বোচ্চ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপী অথচ স্বল্প শ্রমিক নিযুক্তির মাধ্যমে যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োগে কৃষি পদ্ধতি পরিচালিত, তাকেই ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে কম ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় অধিক কর্ষণযোগ্য ভূমিতে অপেক্ষাকৃত কম শ্রম কিন্তু অর্থ ও প্রচেষ্টা বেশি নিয়োজিত এবং উদ্দেশ্যই হচ্ছে বাণিজ্যিক হারে উৎপাদন যা প্রগাঢ় বা নিবিড় কৃষি পদ্ধতির বিপরীত।

পৃথিবীর কম ঘনবসতি পূর্ণ এলাকায় যেমন উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, পেরু ইত্যাদি, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ইত্যাদি অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ ও উচ্চ অক্ষাংশের দেশসমূহে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন-

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে খামারের আকৃতি বড় ধরণের হয়ে থাকে। প্রায় ২৫০ হেক্টরেরও বেশি। উত্তর পশ্চিম ইউরোপে ৫০ হেক্টর বা তার কম কিন্তু উত্তর আমেরিকায় এর আকার ১০০ হেক্টরের বেশি।
২. মূলধন বেশি নিয়োগ অথচ কম শ্রমিক এ পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৩. ভূমির তুলনায় শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ বেশি। অর্থাৎ মাথাপিছু সর্বোচ্চ শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান।
৪. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বাৎসরিক ভিত্তিতে এক ফসলী বিশেষ করে গম চাষের জন্য উপযুক্ত।
৫. এ ধরণের কৃষিতে মূল ভোক্তা অর্থাৎ কৃষকরাই এর কমই ভোগ করে থাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে মূলত নিহিত। অর্থাৎ রপ্তানী বাণিজ্য এ কৃষি পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য।
৬. এ পদ্ধতিতে ভূমির একক প্রতি উৎপাদন কম হয়ে থাকে।
৭. একক খাদ্য শস্যের প্রাধান্য বেশি দেখা যায় বিশেষ করে গম চাষের এবং সত্যিকার অর্থে ৯০% ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি এলাকায় এ ধরণের প্রবণতা বিদ্যমান।
৮. এ ধরণের কৃষিতে উৎপাদিত শস্যের সবই ব্যবসার জন্য রপ্তানী মুখী, খুব কমই ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৯. এ ধরণের কৃষিতে যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রাধান্য যেমন ট্রাক্টর, ফসল কাটা ও মাড়াই যন্ত্র, চালা, ছিটানো ইত্যাদি কার্যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।
১০. এ পদ্ধতিতে ভূমির প্রতি কম যত্ন নেয়ার সময় থাকে।
১১. শুষ্ক ও অনুর্বর জমিতে ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি উপযোগী।
১২. ব্যাপক কৃষি পদ্ধতির জন্য জমি মূলতঃ সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা বন্ধুর ধরণের ভূ-প্রকৃতি ও ক্ষুদ্রায়তনের জমিতে যন্ত্রচালিত লাঙ্গল ব্যবহার খুবই কষ্টসাধ্য।

মিশ্র কৃষি পদ্ধতি

যে কৃষি পদ্ধতিতে একই ভূমিতে এক সঙ্গে শস্য উৎপাদন ও পশু প্রতিপালনের মাধ্যমে আয় করে থাকে তাকে মিশ্র কৃষি পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি আশ্চর্যজনক মিশ্রণ যাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পশুচারণ উভয়ই একই সাথে পরিচালিত হয়। এ ধরণের কৃষির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষাবাদের অনিশ্চয়তার ঝুকি কমে আনা অর্থাৎ যদি শস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে কৃষক পশু বিক্রীর মাধ্যমে কিছুটা পুষিয়ে আনতে সক্ষম। যদিও এ কৃষি পদ্ধতি উন্নত বিশ্বে সীমাবদ্ধ তবে এখন এটি দ্রুত গতিতে সারা বিশ্বময় সম্প্রাসারিত হচ্ছে। সুতরাং এটি একটি কম ঝুকিপূর্ণ এবং পূর্ণ বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা। বাস্তবিকভাবে এটি চাষাবাদ ও পশুচারণ ক্ষেত্রের মধ্যে মাঝামাঝি একটি প্রান্তিক কৃষিজ পদ্ধতি। এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে একজন কৃষক শস্যের চাষাবাদ ও পশু পালন সংযুক্ত করে উভয় থেকে আয় করে। সুতরাং মিশ্র কৃষি পদ্ধতি সুবিধাজনকভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের, যেমন একদিকে পশু পালন অর্থনীতি এবং শস্য উত্তোলন অর্থনীতির একটি মধ্যবর্তী এক কৃষি পদ্ধতি।

মিশ্র কৃষি পদ্ধতি প্রধানতঃ ২টি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যেমন-

ক) ইউরেশিয়া অঞ্চল সাইবেরিয়া, হল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি যেটি ৪০°-৬৫° উঃ অক্ষাংশ মধ্যবর্তী আটলান্টিক উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ) আমেরিকান অঞ্চল- এ অঞ্চলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ বিশেষ করে জর্জিয়া, টেনেসী, ওকল্যাহোম ক্যানসাস, নেব্রাসকা, ওহিও, ইন্ডিয়ানা ইত্যাদি। পশ্চিমের ওরিগন ও ক্যালিফোর্নিয়াও এর অন্তর্ভূক্ত।

এছাড়া বিচ্ছিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় মেক্সিকো, উরুগুয়ে, দক্ষিণ চিলি, আর্জেন্টিনার ও দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেশিয়ার কিছু অংশ এ ধরনেরর চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। অস্ট্রেলিয়াতেও এ ধরণের পদ্ধতি রয়েছে। এ কৃষি পদ্ধতির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকের তিনটি উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে, যেমন ক) পশু খাদ্য হিসেবে (খ) বাজারে বিক্রী করে অর্থ আয়ের পথ হিসেবে গ) নিজেদের ভোগ্যপন্য হিসেবে।
২. ইহা এমন একটি কৃষি পদ্ধতি যা জীবিকা নির্বাহী কৃষি ও বাণিজ্যিক ধরণের কৃষির প্রান্তিক অবস্থায় অবস্থান করে।
৩. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে প্রায় ৯০% জমিতে কৃষিকাজে নিয়োজিত এবং পশু চারণের চেয়ে শস্য উৎপাদনের উপর জোর/তাগিদ দেয়া হয়।
৪. মিশ্র কৃষিতে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি বিদ্যমান। ইহা অনুমেয় যে কম তাপমাত্রার কারণে কৃষকরা বছরের কিছু সময় কাজকর্মহীন অবস্থায় থাকে এবং এ সময়গুলোতে পশুপালন করে থাকে অর্থাৎ অলসতায় দিনাতিপাত করে থাকে।
৫. এ পদ্ধতিতে শস্যের তিনটি ভূমিকা রয়েছে। পশুর খাদ্য, অর্থকরী ফসল এবং পরিবারের সদস্যদের আহারের জন্য।
৬. এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত উদ্বৃত শস্যের অধিকাংশই বাজারে বিক্রি হয়।
৭. মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্যাবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রাখার মানসে মৃত্তিকার পুষ্টি রক্ষার নিমিত্তে বিকল্প শস্যাবর্তন অনুসরণ করা হয়।
৮. চাষাবাদে পর্যায় ক্রমতা এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান। যেমনঃ ক) প্রথম পর্যায়ে নিজেদের ভোগ দখলের জন্য খাদ্যশস্য ও সবজি উৎপাদন করে; খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে পশুপালনের নিমিত্তে ঘাস জাতীয় আলফা, ক্লোভার, হে ইত্যাদি চাষ করে থাকে; গ) পশুপালনের জন্য ভূমির ব্যবহার এবং ঘ) বাণিজ্যিক কারবারের জন্য কিছু দানা শস্যের চাষ করে থাকে। যেমন- গম, রাই।
৯. মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে খামারের আকার সাধারণত বড় ধরণের এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ৫০ থেকে ২৫০ একরের মধ্যে। সাধারণতঃ ইউরোপের দেশগুলোতে ছোট এবং উত্তর আমেরিকাতে বড় আকারের খামার পরিদৃষ্ট হয়।
১০. সারা বছর কোন না কোন কাজ কৃষি ক্ষেত্রে বজায় থাকায় মৌসুমী বেকার/অসলতা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং শ্রমিকের চাহিদা সারা বছর প্রায় একই থাকে।
১১. মিশ্র কৃষি পদ্ধতিতে জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয়ের মান ও যথেষ্ট উচ্চ ও বেশি।
১২. এ কৃষি পদ্ধতিতে পশুর উপর জোর দেয়া হয়। কেননা মুনাফা ক্ষেত্রে পশু পালনই বেশি লাভজনক ও উৎসজনক। গরু, মেষ, মুরগী ও ভেড়া প্রতিপালিত হয় টাকা রোজগারের মাধ্যম হিসেবে। মাংস, দুধ, চামড়া, ডিম, পশম ইত্যাদি একত্রে খামারের আয়ের প্রায় ৮০% সংস্থান করে।
১৩. মিশ্র কৃষি পদ্ধতি বাণিজ্যিক কার্যকলাপের প্রতি মূলতঃ ভূমিকা পালন করে। তবে স্থান ভেদে এর বাণিজ্যিক করণ কম বেশি হয়ে থাকে। আমেরিকা ও আর্জেন্টিনা অঞ্চলে এটি পুরাপুরি বাণিজ্যিক, কৃষকরা সামান্যই ভোগ করে থাকে।
১৪. এ পদ্ধতিতে সাধারণত কৃষক নিজে ও তার পরিবারভূক্ত লোকজন ভূমিতে শ্রম প্রদান করে থাকে।
১৫. জমিতে প্রচুর যন্ত্র, সার, উন্নত মানের বীজ ব্যবহৃত হয়, ফলে জমির উৎপাদনশীলতার হার বেশি।
১৬. নানা রকম শস্যের চাষাবাদের কারণে বিশেষ কোন শস্যের দামে হ্রাস বৃদ্ধি কৃষকের কোন ক্ষতি হয় না।
১৭. মিশ্র কৃষি পদ্ধতি পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সীমিত কেননা একসঙ্গে বিভিন্ন ফসলের উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাব দেখা যায়।
১৮. মিশ্র কৃষি পদ্ধতির জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের সন্নিকটে বাজার, ফসলের চাহিদা ও ভালো মূল্যসহ সুলভ ও সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রগতিশীল ও উন্নয়ন মুখী দক্ষ কৃষক প্রয়োজন।
১৯. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে শস্যের জন্য ভূমির পরিমাণের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয় যার অর্থ দাড়ায় যে মাত্র স্বল্প পরিমাণ পশুর জন্য স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ জন্মানো।
২০. মিশ্র কৃষি পদ্ধতির প্রাধান্য এলাকায় পরিবেশ অনুকূল হয় মাংশের জন্য পশু চারণের। মৃত্তিকা সাধারণতঃ মাঝারি গুনাগুন সম্পন্ন, তাপমাত্রা ও মাঝারি ধরণের শীতকালে ঠান্ডা বরফের উর্ধে গ্রীষ্মকাল ৫০°-৭২°, সমতল জাতীয় ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি।
২১. এ পদ্ধতি অঞ্চলে ঘনবসতি, লোকজনের বেশ হারে নগরের বসবাসের প্রবনতা, লোকজন মাংশ ভোজী, ক্রয় ক্ষমতা বেশি, পরিবহণ ব্যবস্থা বেশ উন্নত ইত্যাদি।

ভূ-মধ্যসাগরীয় কৃষি পদ্ধতি

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি শব্দটি একাধিক মিশ্রণ ধরণের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত (পশু পালন ও শস্য উৎপাদন অথবা উভয়ই) যা পৃথিবীর প্রধানত ৫টি অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। বৃহত্তম অঞ্চলটি প্রায় ভূ-মধ্যসাগরকে বেস্টন করেছে এবং সম্ভবতঃ সর্ববৃহৎ প্রথম বলে এ নামটি এখান থেকে উদ্বৃত্ত হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি একটি একক এবং বহুমাত্রিক চাষাবাদ প্রদর্শনকারী। এখানকার জলবায়ু এমন ভাবে প্রভাবিত করেছে যে চিরায়ত ও বাণিজ্যিক উভয় কৃষি ঐশ্বর্যমন্ডিত হয় যাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন, ফল উত্তোলন, বাগান এমন কি পুষ্পোদ্যান ও ফল উদ্যান সমেত বুঝানো হয়।

ভূমধসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চল ও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্যান্য অঞ্চলে কৃষি ও পশুচারন এ দুয়ের মিলনে বিশেষ ধরণের গড়ে উঠা কৃষি পদ্ধতিই ভূমধ্যসাগরীয় কৃষি পদ্ধতি নামে অভিহিত।

এ অঞ্চলের জলবায়ু একক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শীতকালে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হয় এবং গ্রীষ্মকাল শুস্ক, কোন বৃষ্টিপাত ঘটে না। বার্ষিক বৃষ্টিপাত খুব কম- ৫০ সেঃ মিঃ। মৌসুমী অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও এর ভূ-প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা বিরাজমান। বার্ষিক তাপমাত্রা সাধারণতঃ ১০° সেঃ থেকে ৩০° সেঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ এ অঞ্চলের কৃষি উপভোগ করে উপ-আর্দ্র ধরণের জলবায়ু যেখানে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০″-৪০″ তবে তাও আবার অনিশ্চিত প্রকৃতির।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত, তাদের মধ্যে-

১. ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, যেমন- ফ্রান্স, স্পেন, আলজিরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক, তিউনিশিয়া, গ্রীস, পর্তুগাল, ইতালি ইত্যাদি।
২. যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ, (৪) দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার নিম্ন ডার্লিং নদী অববাহিকা অর্থাৎ ৩০°-৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ-অক্ষাংশে অবস্থিত দেশসমূহে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি বিদ্যমান।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি একটি একাধিক কার্যক্রম যেখানে শস্য উৎপাদন, বাগান, মদ্য শিল্প, পশুচারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
২. এ কৃষি পদ্ধতি হর্টিকালচার ও শাক সবজির সমন্বয়ে গঠিত।
৩. শীতকালীন বৃষ্টিপাত সাধারণত এ অঞ্চলে ফল ও সবজি উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে।
৪. গ্রীষ্মকালীন শুস্ক সময়ে ডুমুর, জলপাই ইত্যাদি প্রকারের ফলের চাষ ভাল হয়।
৫. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে পশুচারণ ও উচ্চ ধরণের আর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় বহন করে।
৬. এ কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদিত শস্য মূলতঃ বাজারমুখী।
৭. এ কৃষি পদ্ধতিতে মূল্যবান মদ্য উৎপন্ন হয়।
৮. জলপাই, ডুমুর, খেজুর এবং আঙ্গুর প্রভৃতি এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদ হয়ে থাকে।
৯. ভূমির উচ্চতা ভিত্তিক চাষাবাদ এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে বিদ্যমান যেমন- সাধারণতঃ নিম্ন উপত্যকায় সবজি, পর্বতের উচ্চ অংশে আঙ্গুর, ডুমুর, জলপাই এবং পর্বতের নিম্নাঞ্চলে দানা জাতীয় শস্যের চাষ হয়।
১০. শীতকালীন বৃষ্টিপাতের দরুন গম, বার্লি, ভূট্টোর সঙ্গে শিম, মটরশুটি, গাজর, পিয়াজ, টমেটো, লেটুস বাধাকপি ইত্যাদি সবজির চাষ এবং ধান, সবজি, ফল প্রভৃতি সেচের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন ফসলের চাষ হয়ে থাকে।

এক ফসলী কৃষি পদ্ধতি

যে কোন একটি ফসল উৎপাদনের নিমিত্তে যে কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত, তাকে এক ফসলী কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। অর্থাৎ এটি একটি এক ফসল কেন্দ্রীক চাষাবাদ পদ্ধতি যার প্রধান উদ্দেশ্য নিহিত রফতানীমূলক কর্মকান্ডে এবং উৎপাদনের সিংহভাগই যায় আন্তর্জাতিক বাজারে। এটি একটি বৈচিত্র্যেসূচক বাগান কৃষি যেখানকার মৃত্তিকা ও কৃষিজ জলবায়ুর অবস্থা একক শস্য চাষাবাদের সহায়ক।

অনুন্নত অঞ্চলসহ যুক্তরাষ্ট্রের তুলা বলয়ে তুলা চাষ, কানাডার দক্ষিণাংশের প্রেইরী অঞ্চলে গম, ভারতের নিম্ন দামোদর উপত্যকায় পাট ও উত্তর বঙ্গে চা, কিউবায় ইক্ষু, জাপানে ধান, ব্রাজিলের কফি চাষ প্রভৃতি অঞ্চলে এক ফসলী কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. সাধারণতঃ অনুন্নত অঞ্চলে কৃষির বৈচিত্রায়নের অভাবে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।
২. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে উপযুক্ত ফসল বছরের পর বছর চাষ করা সম্ভব। ফলে কৃষকগণ ঐ ফসলটি সম্পর্কে পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। তবে ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় কিন্তু জমির উর্বরতা নষ্ট হতে থাকে।
৩. একটি মাত্র ফসলের চাষাবাদের দরুন ঐ সময়টুকু ব্যতীত বাকী সময়ে কৃষি সংশ্লিষ্টদের কাজহীন অবস্থায় বসে থাকতে হয়। ফলে মুঙ্গা বা বেকরাত্ব লক্ষ্য করা যায়।
৪. সাধারণতঃ কৃষিজদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানীর উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয়, ফলে বাজারের মুখাপেক্ষী চাহিদা ও দামের অনিশ্চয়তা ব্যবসা বাণিজ্য চক্রের মন্দা, বেকারত্ব ও পারিবারিক গোলমালের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে উৎপাদন ও বিক্রয়ে প্রায়ই অসামঞ্জস্য ঘটে থাকে।
৫. বাজার চাহিদা অনুশীলনের মাধ্যমে মুনাফার মানসে নব নব অঞ্চলে ঐ সব ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

দুই ফসলী কৃষি পদ্ধতি

যে কৃষি পদ্ধতিতে বছরে দুইটি ফসল/শস্য চাষ করা হয়, তাকে দ্বৈত বা দুই ফসলী কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, উত্তর পশ্চিম ইউরোপ এবং ক্রান্তীয় আফ্রিকার কিছু অংশে এই ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. প্রতি বছর দুটি শস্যের উত্তোলন এ কৃষি পদ্ধতির মূখ্য উদ্দেশ্য।
২. বর্ষাকালে বাংলাদেশ ও ভারতে এ পদ্ধতিতে প্রধানতঃ খাদ্যশস্য, যেমন খারিপশস্য উৎপাদিত হয়, আর শুস্ক, শীতকালে সবজি, ডাল, সরিষা ইত্যাদি যেমন রবি শস্য উৎপাদন করে থাকে।
৩. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে জমিতে চাপ বহাল থাকায় উর্বরতা বিনষ্ট হতে পারে।
৪. কোন কারণে একটি ফসলের ক্ষতি সাধন হলেও কৃষকের বড় ধরণের বিপদের সম্মুখীন হতে হয় না।

বহুত্ব বা বহুবিধ কৃষি পদ্ধতি

বহুত্ব কৃষি হচ্ছে বহু শস্য বিন্যাস কৃষি পদ্ধতি যেখানে প্রতি বছর দুয়ের অধিক শস্য উত্তোলন করা হয়। অর্থাৎ একই জমিতে বছরে বহু শস্যের চাষাবাদের মাধ্যমে শস্য ঘরে উত্তোলন করা হয়, তাকেই বহুত্ব কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উচ্চ ঘন বসতি পূর্ণ এলাকা বিশেষ করে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিদ্যমান।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. উচ্চ জনসংখ্যার চাপ, চাষাবাদযোগ্য ভূমির অভাব এবং কৃষির উপর বেশি নির্ভরশীলতার দরুন, সারা বছরই ফসলের চাষাবাদ ব্যতিরেকে অন্যকোন গত্যন্তর নেই হেতু, এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে।
২. অধিবাসীদের উপার্জন ও খাদ্য সরবরাহের তাগিদে ভূমি সর্বদাই চাষাবাদের মাধ্যমে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে জমিতে উর্বরতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

সামন্ততান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি

ইহা একটি মধ্যযুগীয় কৃষি পদ্ধতি, যেখানে জমিদার বা জমির মালিকানার দাবিতে সম্পূর্ণভাবে কৃষি পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং জমির মালিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমির উপর মালিকানাসহ কৃষি পদ্ধতির পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করাকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চল অনুন্নত, সেখানেই এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিদ্যমান। তবে মধ্যযুগীয় এ কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন বর্তমানে হুবাহুব না থাকলেও সমাজে সংশোধিত আকারে এখনও চলছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকদের অধিকাংশই জমির মালিকানাবিহীন এবং উৎপাদনের খুব সামান্যই পেয়ে থাকে।
২. এ পদ্ধতিতে উৎপাদন খুবই নিম্ন মানের ও কম কেননা এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং উৎপাদন পদ্ধতি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

৩. এ কৃষি পদ্ধতি জমির প্রকৃত মালিক থাকেন অনুপস্থিত।
৪. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে জমিদার ও প্রকৃত চাষীর মাঝে মধ্যসত্ব ভোগ্য শ্রেণীর উপস্থিত বিদ্যমান।
৫. এ পদ্ধতিতে কোন উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না।
৬. কৃষিজ পণ্যের উন্নতি ও বেশি উৎপাদনের প্রতি ভূ-স্বামীর কোন লক্ষ্য থাকে না।

ধনতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি

ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের নিমিত্তে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির মূলতঃ প্রচলন এবং এতে ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় এবং সামাজিক কল্যাণ গৌন। অর্থাৎ যে কৃষি পদ্ধতিতে ধনায়নের নিমিত্তে যে সব ফসল উৎপন্ন করা হয় তাই ধনতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি।

ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এ ধরণের কৃষি প্রথার প্রচলন বিদ্যমান। তাছাড়া ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা রাজ্যেও এ ধরণের কৃষি ব্যবস্থা দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. সমাজের সকলের কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার তাগিদই এ কৃষি পদ্ধতিতে বিদ্যমান।
২. এ কৃষি পদ্ধতিতে জমির মালিক বাজারে পণ্য সামগ্রী বিক্রীর মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় পুনরায় পুজি বিনিয়োগ করে থাকেন।
৩. এ ধরণের কৃষিতে যুগান্তকারী উদ্ভাবন ঘটে, প্রচুর যন্ত্রের ব্যবহার, উন্নত সার ও বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার এবং জমি ও মাথাপিছু উৎপাদনে আকাশ কুসুম বৃদ্ধি পায়।

সমাজতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে ভূমির মালিকানা ও সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণভার রাষ্ট্রের। কৃষক তাদের উৎপাদন-মজুরী অংশ শুধু পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে জমি ও তার চাষাবাদ, নিয়ন্ত্রণ, মূলধন ইত্যাদি রাষ্ট্র বহন করে, সে পদ্ধতিই সমাজতান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি।

চীন ও পূর্বতন সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানের চীন ও কিউবা ছাড়া আর কোথাও এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন নেই।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ব্যক্তিগত হাত থেকে ভূমির মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্বার্থ গোষ্ঠীর পরিবর্তে জনগণের সরকারের নিকট এ কৃষি পদ্ধতিতে প্রচলন।
২. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন জমিজমা থাকে না।
৩. রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে বৃহদায়তন খামারে চাষাবাদ এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন।
৪. উন্নত যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে।
৫. শস্য উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে এ কৃষি পদ্ধতিতে বেশি হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় খামার পদ্ধতি

এটি এক সমাজতান্ত্রিক ধারণা। যেখানে খামার সংগঠনের মালিক রাষ্ট্র এবং যন্ত্রপাতি মূলধন এবং বাজাজাতকরণসহ মনিটরিং ব্যবস্থার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে। অর্থাৎ যে সকল খামার মালিকসহ সমস্ত ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাষ্ট্রের, তাকে রাষ্ট্রীয় খামার পদ্ধতি বলা হয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রবক্তা। বর্তমানে পৃথিবীর কোথায়ও এ ধরণের পদ্ধতির প্রচলন নেই বললেই চলে।

এ ধরণের খামার বর্তমানে আর কোথাও নেই, শুধু ইতিহাসে এর স্থান থেকে গেছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ইহা একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে কৃষি পদ্ধতি।
২. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর সুযোগ অনুপস্থিত।
৩. এ কৃষি পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির প্রয়োগ যথাযথভাবে সুযোগ বিদ্যমান থাকে।

৪. ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্য এ কৃষি পদ্ধতিতে থাকে না। তবে উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে কৃষকের ভোগের অংশ বেশি থাকে।
৫. এ পদ্ধতিতে কোন ধন বৈষম্য থাকে না।
৬. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে কৃষির উন্নতি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও গবেষণার প্রকোপ এখানে বেশি উপস্থিত।

সমবায় খামার কৃষি পদ্ধতি

যে কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকদের সমস্ত চাষাবাদ যোগ্য ভূমি সমবায়ের মাধ্যমে যে সকল ফসল উত্তোলন করা হয় তাকে সমবায় খামার কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। একদা এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিকে উন্নয়নশীল কৃষি অর্থনীতির সর্ববিধ সংকট মোচনকারী হিসেবে বিবেচিত ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে কৃষকরা সকলের পরস্পর উপকারের সার্থে তাদের সমস্ত ভূমি একত্রিত করণের মাধ্যমে চাষাবাদ করাই সমবায় খামার কৃষি পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

চীন, ইস্রায়েল, মেক্সিকো ও ভারতে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. এ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনের জমির একত্রীকরণের মাধ্যমে বৃহদাকায়তন উপায়ে চাষাবাদ করা হলেও মালিকানা কিন্তু বজায় থাকে।
২. বৃহৎ আকারের খামারগুলোতে বড় ধরণের যান্ত্রিকীকরণ সম্ভব ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস কিন্তু উৎপাদন পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।
৩. স্বল্প মূলধন হলেও সমবায় প্রথার মাধ্যমে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত ধরণের চাষাবাদ সম্ভব।

ব্যক্তিগত কৃষি পদ্ধতি

ব্যক্তিগত কৃষি পদ্ধতিতে ভূমির মালিক একজন এবং সমস্ত চাষাবাদ প্রক্রিয়া ঐ একজন দ্বারা মনিটরিং করা হয় তার নিজের সন্তুষ্টির মানসে। অর্থাৎ কৃষক তার জমিতে নিজ শ্রম দ্বারা অথবা ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে যে কৃষিকার্য পরিচালনা করা হয়, তাকেই ব্যক্তিগত কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি দুটি উপায়ে করা হয়ে থাকে, যেমন- (১) কৃষক নিজে তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ অথবা ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগদানের মাধ্যমে জমি চাষ করে তার উৎপাদিত শস্য তারাই ভোগ করেন। এই প্রথাকে নিজস্ব ব্যক্তিগত কৃষি পদ্ধতি বলা হয়, (২) বর্গা প্রথা বা ভাগচাষী হচ্ছে ঐ জমিতে ভাগচাষী জমি চাষ করে উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ জমির মালিককে প্রদান করে কিন্তু কোন সময় সে ঐ জমির মালিক হতে পারে না।

ভারত ও বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি সমাজে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. জমির মালিকানা না থাকলেও কৃষক তার নিজের মত করে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত পন্যের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে পারে।
২. যেহেতু নিজের জমি নয়, সেহেতু সার, বীজ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকদের অনীহা প্রায়ই বিদ্যমান থাকে।

বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি

যে কৃষি পদ্ধতি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ কিন্তু ব্যাপক যান্ত্রিকীকরণের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন খামারে শস্য উৎপাদন করা হয় তাকে বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের ৩০°-৫৫° মধ্যবর্তী অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ ও দক্ষিণ গোলার্ধের কম বসতিপূর্ণ উপমেরু অঞ্চলে বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত। অর্থাৎ ১) ইউক্রেন থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়া, উজবেকিস্তান; ২) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড জার্মানী, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ড; ৩) ইউরোপীয় স্পেপ, উত্তর আমেরিকার প্রেইরী আর্জেন্টিনার পথপাস দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্দ নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবারী সমতল ভূমি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নিম্ন তৃণভূমি অঞ্চলে এ ধরণের কৃষির প্রচলন বিদ্যমান।

তাছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে ম্যারেডার্লিং নদী অববাহিকা, পার্থ ফ্রিম্যান্টলের নিকটবর্তী অঞ্চলেও এ ধরণের কৃষি প্রথা রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. উচ্চ মানুষ ও ভূমি অনুপাত, খামারের আকার বৃহৎ, শ্রমলব্ধ শ্রমিকের অভাব, ভূমির একর প্রতি কম উৎপাদন, মাথাপিছু উৎপাদন বেশি, একক শস্যের প্রাধান্য, মূলধনের প্রগাঢ়তা, স্থায়ী ও চলতি ব্যয়ের প্রাচুর্যতা, বেশী যান্ত্রিকীকরণর মাত্রা, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এ কৃষি পদ্ধতিতে বিদ্যমান।
২. এ কৃষি পদ্ধতিতে অর্থকরী ফসল (যেমন গম) উৎপাদনের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।
৩. যে সব অঞ্চলে তাপমাত্রা বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে গড়ে ২০° সে এবং বৃষ্টিপাত ২৫-৫০ সেঃ মিঃ, সেখানে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি অনুসৃত হয়।
৪. উর্বর কৃষ মৃত্তিকা অথবা সারনোজেম মৃত্তিকা এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির উপযোগী।
৫. রপ্তানীমুখী ফসল উৎপাদনের কারণে আন্তর্জাতিক বাজার চক্রের সঙ্গে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি, নব নব প্রতিযোগিতার আশংকা ইত্যাদি এ কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

আদিম জীবিকাভিত্তিক স্থানান্তরিত কৃষি পদ্ধতি

এটি সবচেয়ে প্রাচীন, সহজ, অপরিবর্তিত এবং নিজেদের জীবন ধারণের নিমিত্তে চাষাবাদ, বেশীর ভাগ ক্রান্তীয় উপজাতীয় গোত্র দ্বারা অনুসৃত হয়। অর্থাৎ যে প্রাচীন, অনুন্নত কৃষি পদ্ধতিতে মূলত ক্রান্তীয় উপজাতীয় লোকজনের অনুসরণের মাধ্যমে জীবিকা ধারণ করে থাকে সেই কৃষি পদ্ধতিকে আদিম জীবিকা ভিত্তিক স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

ক্রান্তীয় অঞ্চল বরাবর বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, কেন্দ্রীয় আমেরিকা এবং ক্রান্তীয় আফ্রিকায় এ ধরণের চিরায়ত প্রথায় চাষাবাদ বিদ্যমান। অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী অববাহিকা, মেক্সিকো মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, বাংলাদেশসহ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত অঞ্চলে এ কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিদ্যমান।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. যদিও স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতি বলা হয়, তবে বিভিন্ন স্থানে এর বিভিন্ন নামের প্রচলন বিদ্যমান। যেমন- ঝুম (বাংলাদেশসহ উত্তর পূর্বভারত), লাভাং (মালয়েশিয়া), হুসাই (ইন্দোনেশিয়া), চেনা (শ্রীলংকা) কেইন জিন ও সোয়াইডেন (ফিলিপাইন), টামরাই (থাইল্যান্ড), টাউনগা (মায়ানমার), মাসোলি (জায়ারে) সিলপা (বোডেশিয়া) নগাসু (সুদান), কনুকো ও রোকা (ব্রাজিল ও ভেনিজুয়েলা) ইত্যাদি।
২. এ কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদিত সমস্ত ফসলই তাদের নিজেদের ক্ষুধা/ চাহিদা মেটায়।
৩. গোষ্ঠী জীবন এ কৃষি পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে পুরো দল বা গোষ্ঠী প্রধানের উপর থাকে।
৪. এ ধরণের কৃষিতে স্থানান্তরের পথে, দলের সর্দার বা দলপতি চাষাবাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘন বনভূমি পছন্দ ও চিহ্নিত করে থাকে, যাতে ভূমির ঢালসহ সুষ্ঠু নিস্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে তারা এ বনভূমির বন উজাড় করে দেয়, আগুনে পুড়িয়ে অথবা কর্তন প্রক্রিয়ায়। সেখানে ভূমি পরিস্কার, বীজবপন ও চাষাবাদ চলে বেশ কয়েক বছর। আবার ২/৩ বছর পর ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাসা বেধে আবার চাষাবাদ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।
৫. এ পদ্ধতিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূমিখন্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে একসঙ্গে বহুশস্যের চাষাবাদ প্রথার প্রচলন বিদ্যমান।
৬. মামুলী ধরণের যন্ত্রপাতি যাতে কোন পরিবর্তনের ছোয়া লাগেনি এ কৃষি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৭. আগুন দ্বারা বনভূমি পরিস্কার করার দরুন ঐ মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধি করে।
৮. এ পদ্ধতিতে শস্যবর্তনের পরিবর্তে ক্ষেত্রাবর্তন পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।
৯. এ কৃষি পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আজও আদিম ও অমার্জিত।
১০. এ আদিম পদ্ধতি আজও প্রধান জনস্রোত থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এ জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ গভীর অরণ্যে বা পাহাড়ী এলাকায় বসতি স্থাপন করায় সভ্যতার মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।
১১. এ কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকরা সাধারণতঃ বন্যজন্তু ও মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।
১২. কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিদের দৃষ্টিতে এ কৃষি পদ্ধতি একটি অবৈজ্ঞানিক ও ধ্বংসাত্বক। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে বনজ সম্পদের ধ্বংস যথাযথ অব্যবহার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।
১৩. বনভূমি উজাড়ের কারণে মৃত্তিকা সহজে ক্ষয় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আর মৃত্তিকা ক্ষয় ভূমিধস সহ নদীপথকে সংকীর্ন করে দেয়।

১৪. এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ বড় ধরণের বন উজাড়ের কারণ ঘটায় এবং ঐ বনভূমি পুনরায় গড়ে উঠতে প্রায় ৫০/৭০ বছর লেগে যায়। ফলে এ ধরণের ধ্বংস লীলা বড় আকারের ভয়ানক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।
১৫. নদীর গতি পথ প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। ফলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিকম্প ঐ এলাকার জন্য বড় বিপদজনক।
১৬. যেহেতু এ কৃষি পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে জীবিকা নির্বাহী, সুতরাং যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, বন্যা, খরা মানুষকে বহুদিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করতে পারে।
১৭. যেহেতু এ কৃষি পদ্ধতি গভীর ঘন অরণ্য বিদ্যমান, সুতরাং বন্য প্রাণী, পোকামাকড় ও অসুখ বিসুখ শস্য পদ্ধতিকে ওলট পালট করে দিতে পারে।
১৮. পরিবেশ সংরক্ষণ কল্পে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি বিপজ্জনক ও তা বিভিন্ন উপায়ে নিরুৎসাহ করা উচিত।

আদিম জীবিকা নির্বাহী স্থায়ী কৃষি পদ্ধতি

স্থানান্তর জীবিকা নির্বাহী কৃষি পদ্ধতির মত না হলেও স্থায়ী আদিম জীবিকা নির্বাহী ভিত্তিক কৃষি হচ্ছে স্থির ও অপরিবর্তনীয়। গ্রাম বেষ্টিত এলাকায় স্থায়ী ভিত্তিক এ ধরণের কৃষির প্রচলন খাতে স্থানান্তর ধরণের কৃষির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ স্থানান্তর কৃষির দ্বিতীয় পর্যায়ের এ কৃষি পদ্ধতিতে কোন গ্রামীণ পরিবেশ বেষ্টিত এলাকায় স্থায়ীভাবে যে কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিদ্যমান তাই আদিম জীবিকা ভিত্তিক স্থায়ী কৃষি পদ্ধতি।

এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অরণ্যভূমির প্রান্তিক স্থানসমূহ অথবা বাইরে, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। দক্ষিণ পুর্ব এশীয় দেশসমূহে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া মায়ানমার আমাজান উপত্যকা এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি ব্যাপক ভাবে অনুসৃত হয়।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি মানুষ শ্রমিকের পরিবর্তে পশু শক্তির উপর নির্ভরশীল।
২. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন যেসব স্থানে বিদ্যমান সে সব স্থানে অন্যান্য ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যেমন- খনি, ব্যবসা ও শিল্পের প্রচলন থাকে।
৩. এ কৃষি পদ্ধতি সাধারণতঃ স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন কারী উপজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত।
৪. এ কৃষি পদ্ধতিতে বেশীর ভাগই দানা শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।
৫. ইহা সত্যিকার অর্থে স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি পদ্ধতি। সামান্য উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারে বিক্রীর জন্য যেতে পারে।
৬. কিছু শ্রমলব্ধ কিন্ত জটিল আধুনিক ধরণের মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহার এ কৃষি পদ্ধতিতে দেখতে পাওয়া যায়।
৭. এ কৃষি পদ্ধতিতে সাধারণতঃ ধান, গম এবং বার্লি জাতীয় শস্যের উৎপাদন হয়ে থাকে।
৮. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে সারের ব্যবহার, নদী বা পুকুরের পানি সেচ ও জমিতে নিবিড় প্রকৃতির চাষাবাদের প্রচলন দেখা যায়।

খারিফ কৃষি পদ্ধতি

এটি একটি আঞ্চলিক ধরণের কৃষি পদ্ধতি যা বর্ষার সময়ে প্রচলন এবং মূলতঃ খাদ্য শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে। বাংলাদেশ ভারতসহ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আবির্ভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় এবং বর্ষাকালে যে সকল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে, খারিপ কৃষি পদ্ধতি তাদের অন্যতম। ভারত ও বাংলাদেশে বর্ষাকালে যে কৃষি পদ্ধতি বিশেষ করে আউশ ও আমন ধান জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তাকে খারিপ কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। সাধারণতঃ প্রধান খাদ্য শস্য ধান, গম, যব ইত্যাদি উৎপাদন করা হয় এ পদ্ধতি অবলম্বনে।

বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সেবিত অঞ্চলেই এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে মূলতঃ আউশ ও আমন ধানের চাষাবাদ করা হয়।
২. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি অনিয়মিত ও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফলে উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।
৩. অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও অনিয়মিত বৃষ্টির কারণে কখনো বন্যা, খরা, অথবা আজন্ম ইত্যাদি নানা রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে।

রবি কৃষি পদ্ধতি

শীতকালীন কৃষিই রবি কৃষি নামে পরিচিত। অধিকাংশ খরা প্রবণ শস্য যেমন ডাল, সবজি, তৈলবীজ ইত্যাদি এ কৃষি পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। গ্রীষ্মের শুরুতে এ সব ফসল পাকে/ঘরে উত্তোলন করা হয় বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর শীতকালীন প্রত্যাবর্তন সময়ে (অক্টোবর-নভেম্বর) যে কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত তাই রবি কৃষি পদ্ধতি নামে অভিহিত।

দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ইত্যাদি অঞ্চলে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে আলু, পিয়াজ, কপি, সরিষা, গাজর, বীট প্রভৃতি সবজি এবং গম, ধান, ছোলা, জোয়ার ইত্যাদি ফসলের চাষ করা হয়।
২. শীতকালে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির প্রচলন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যাবর্তন মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৩. গ্রীষ্মের শুরুতে এ পদ্ধতির ফসল উত্তোলন করা হয়।

শুষ্ক কৃষি পদ্ধতি ঃ যে সব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০ সে মি বা তার চেয়ে কম এবং সেচকার্য কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, সে সব অঞ্চলে যে কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত তাকেই শুষ্ক কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। অপ্রতুল বৃষ্টিপাতের দরুন এ ধরণের কৃষিকাজের সকল প্রচেষ্টা থাকে দুষ্প্রাপ্য পানির সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার। এ কৃষি পদ্ধতিতে যব, গম, রাই, ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি ধরণের শস্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ পদ্ধতি পুরাতন মান্ধাতার আমলের প্রায় শুষ্ক, উপমরু ও শুষ্ক অন্তঃ মালভূমি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উপমরু অঞ্চলের বালিকাময় দোঁআশ মৃত্তিকাতে বেশি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত শুন্য হলেও খুব কমই অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং এ অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর থাকে। কৃষকদের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখা এবং উক্ত পানির বৈজ্ঞানিক ও খুব সম্ভাব্য উপায়ে সর্বোচ্চ ব্যবহার। ধাপ, সমতা নির্মাণ মাঠের নিকটবর্তীতে এবং নিয়মিত নিড়ানো হচ্ছে কতকগুলো উপায়- যাতে মৃত্তিকার আর্দ্রতা সংরক্ষণে সহায়ক হয়ে থাকে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান শুষ্ক পদ্ধতি প্রচলিত অঞ্চলসমুহের মধ্যে (১) রকি পর্বতমালার পশ্চিমাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডা; (২) দঃ ব্রাজিল ও মেক্সিকোর অভ্যন্তরস্থ মালভূমি অঞ্চল; (৩) লেবানন, ইস্রায়েল মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক ও প্যালেস্টাইন; (৪) ভারতের রাজস্থানের পশ্চিমাংশ, পুর্ব ইউরোপ, কিরখিজিয়া আর্মেনিয়া, কাজাকস্থান এবং মধ্য চীন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. এ কৃষি পদ্ধতিতে যেহেতু সামান্য বৃষ্টির পানির অপচয় রোধ করার নিমিত্তে পানি সংরক্ষণের জন্য ভূমিকে এমন ভাবে ধাপযুক্ত করা হয় যাতে ইহা ধৌত না হয়ে যায় এবং সমস্ত পানিই যেন চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. এ পদ্ধতিতে সাধারণতঃ পানির অপচয় রোধকল্পে বড় বড় জমিকে ছোট ছোট জোতে বিভক্ত করা হয়।
৩. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে ব্যাপক চাষাবাদের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে খুব নরম/শিথিল করা হয় যাতে বৃষ্টির পানির ভুতলে/গভীরে প্রবেশ করতে পারে।
৪. এ পদ্ধতিতে প্রতিপশলা বৃষ্টিপাতের পর সূক্ষ্ম ধুলিকণার আবরণ দিয়ে জমিতে ছিটিয়ে দিলে ভূমিটি বায়ুর দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়, বাষ্পীভবন রোধ ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা পায়।
৫. বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির চুড়ান্ত সদ্ব্যবহার করাই এ পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। তাই বৃষ্টির পানি ধরে রাখার নিমিত্তে কূপ অথবা গভীর খাল খনন করা হয়।
৬. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে জমিতে কোন আগাছা থাকলে তা সরিয়ে ফেলা হয় যাতে আগাছাগুলো প্রাপ্য পানিতে ভাগ বসাতে না পারে।
৭. জমিতে পানি ঘাটতির মোকাবিলায় যে সকল উদ্ভিদের পানির প্রতি দূর্বলতা কম অথবা পানির চাহিদা কম সে সকল যেমন- গম, যব, রাই, জোয়ার, ভূট্টা, ডাল ইত্যাদি চাষ করা হয়।
৮. তাড়াতাড়ি শস্য কর্তন করার প্রচেষ্টা/প্রবণতা এ পদ্ধতিতে প্রচলিত।
৯. যেহেতু এটি মূলধন ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি, সেহেতু সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকে একটি মাত্র অর্থকরী ফসলের দিকে, যাতে ব্যয় লাভ অনুপাত লাভের দিকে থাকে।
১০. এ পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় বেশি কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কম।
১১. সাধারণতঃ প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যবহৃত রাখলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা পুনরদ্ধার করা সম্ভব।

সেচ কৃষি পদ্ধতি

সেচ কৃষি পদ্ধতি যে সকল অঞ্চলে প্রচলিত যেখানে বৃষ্টিপাত ঋতুভিত্তিক এবং একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে সীমাবদ্ধ থাকে। আর্দ্র/ভেজা মাসগুলোতে অতিরিক্ত পানি এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যাতে শুকনো মাসগুলোতে নিয়মিত ভাবে কৃষি কার্যের জন্য সরবরাহ করতে পারে। অর্থাৎ কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম বা অনিশ্চিত হলে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে যে সকল কৃষিকার্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে, তাকে সেচ কৃষি পদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ঘন বসতিপূর্ণ মৌসুমী বায়ু সেবিত অঞ্চলসহ এশীয় ও আফ্রিকীয় উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে সেচ কৃষি পদ্ধতি বিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী উপত্যকা অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন- সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি, নীলনদ, হোয়াংহো, ইয়াংসিং, মিসিসিপি, টেনেসি, স্যানজোয়াকুইন প্রভৃতি নদী উপত্যাকায় এ ধরণের পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. বিভিন্ন প্রকার সেচন পদ্ধতি অবলম্বনে নদী, খাল, বিল, ভূ-গর্ভস্থ পানি ইত্যাদি জলাধার থেকে কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ দেয়া হয়। সুতরাং ভূমিরূপ, মূলধন ইত্যাদি প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বনের সুযোগ এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান।
২. এ কৃষি পদ্ধতিতে সারা বছরই পানি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় এমন কি প্রান্তিক ভূমিতে চাষাবাদ করলেও।
৩. এ পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় বেশী।
৪. এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে ভূমিতে লোনা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে।
৫. বাঁধ, খাল ইত্যাদি নির্মাণ ও খননের জন্য এটি ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি। তাই ফসল উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই উচ্চ হার পূরণার্থে চাষীরা সাধারণতঃ ইক্ষু ও পার্ট জাতীয় অর্থকরী শস্যাদি উৎপন্ন করে থাকে।
৬. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতির মূল লক্ষ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার ও তার প্রভাব।
৭. এ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদের সুযোগ থাকে। বিভিন্ন কৃষি সামগ্রী যেমন- সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মানসে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
৮. সেচ প্রকল্পের জন্য ব্যাপক এলাকার প্রয়োজন।
৯. ভূমি থেকে মানুষ সরানো, পুনঃ বাসন ইত্যাদিতে প্রচুর খরচ হয়ে থাকে।
১০. ব্যাপক সেচের কারণে মৃত্তিকার মান হ্রাস পেতে থাকে এবং মৃত্তিকা ক্ষয়ের কাজও ত্বরান্বিত হয়।
১১. ব্যাপক ভিত্তিক সেচ কার্যের জন্য মৃত্তিকাতে লবণতা বৃদ্ধি ঘটে। ফলে অতি অল্প সময়েই ভূমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি

জলবায়ুর বিভিন্নতার কারণে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ভূমিভাগের আর্দ্রতার তারতম্য ঘটে এবং সাধারণতঃ বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে মৃত্তিকার আর্দ্রতার মাত্রা বেশী থাকে। সুতরাং অতিরিক্ত পানি সেচ না দিয়ে ঐ আর্দ্র মৃত্তিকায় যে কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত, তাকে আর্দ্র কৃষি পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

আর্দ্র কৃষি ঐ সকল অঞ্চলে বিদ্যমান যেখানে প্রচুর বৃষ্টি, সঞ্চিত পানির পরিমাণ অতিরিক্ত যা নিয়মিতভাবে প্রয়োজনে খামারে সরবরাহ দানে সক্ষম। বর্ষা ঋতু হচ্ছে বপন সময় আর শস্য কর্তন হয় গ্রীষ্মকালে। বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শস্যের ধরনে স্থানভেদে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টি নির্ভর উদ্ভিদ, যেমন- ধান, পাট, ইক্ষু ইত্যাদি আর্দ্র কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে।

এ কৃষি পদ্ধতি পৃথিবীর কর্কটক্রান্তিও মকর ক্রান্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে মৌসুমী এশিয়া, ক্রান্তীয় আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, ভারত, ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে সাধারণতঃ দেখা যায়। তাছাড়া নাতিশীতোষ অঞ্চলের কোন কোন স্থানে এ কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত। তবে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে সেচকার্যের প্রয়োজন হয় না।

বৈশিষ্ট্য

১. এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ তুলনামূলকভাবে সুলভ ও সহজ।
২. সাধারণতঃ এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে বর্ষাঋতুর প্রথম দিকেই শুরু করা হয়।
৩. আর্দ্র কৃষি পদ্ধতিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দ্বারা শস্যের ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে থাকে।

৪. বৃষ্টিপাতের স্থায়িত্বের পরিমাণের দ্বারা উৎপাদন মানকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।
৫. এ পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় কম হয়।
৬. অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও বন্যার কারণে উৎপাদন বিনষ্ট হতে পারে এবং ফলস্বরূপ ভয়ানক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।
৭. প্রচুর বৃষ্টির কারণে মৃত্তিকা ক্ষয় ত্বরান্বিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস করে এ পদ্ধতির কৃষিতে।
৮. বৃষ্টিপাতের উপর অতি নির্ভরশীলতার দরুন, মাত্র সময়মত বৃষ্টিই এ ধরণের চাষাবাদ নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে লম্বা শুষ্ক চাষাবাদ প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করতে পারে।

আবাদী/বাগান কৃষি পদ্ধতি

বাগান কৃষি হচ্ছে এক ধরণের রপ্তানী ভিত্তিক বিশেষ কৃষি পদ্ধতি যেখানে একটি ফসলের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। এটি একটি প্রকান্ড ধরণের সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ ভৌত অবকাঠামোসহ শিল্পোদ্যোগ যেখানে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই মূখ্য উদ্দেশ্য। ইহা শুধু শস্য চাষই জড়িত নয়, এর সাথে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়ক, পরিবহণ এবং রফতানী ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এটি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রান্তিক অবস্থায় বিরাজমান।

বাগান কৃষি ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বস্থ দেশসমূহ নিয়ে অবস্থিত। এ কৃষির সূচনা ঘনিষ্টভাবে উপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তবে ইহা ক্রান্তীয় অঞ্চল বরাবর বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ ঘটেছে।

বাগান কৃষির উল্লেখযোগ্য দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়ায় কফি চাষ; কিউবা, পেরু, প্রোটারিকো ও ফিলিপাইনে ইক্ষু চাষ; ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিযা ও বাংলাদেশে চা চাষ; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইকোয়েডর ও ব্রাজিলে কোকোয়া চাষ; ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের নিম্নভূমি অঞ্চল যেমন মেক্সিকো, জামাইকা, কলম্বিয়া, পানামা, কোষ্টারিকায় কলা চাষ এবং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কাম্পুচিয়া, মায়ানমার ও ভারতে রবার চাষ ইত্যাদি।

বাগান কৃষি উপনিবেশিকতার ফসল যা কোন সময়ই স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্দেশ্য নয় বরং ব্যবসা বাণিজ্য, রাজকীয় মূলধনে নিয়োজিত একটি বিশেষ ফসলের আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরনার্থে ইহার উদ্ভব ঘটেছিল। চিরায়ত উদাহরণে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকায় ইংরেজদের দ্বারা চা এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ইংরেজ ও ডাচদের দ্বারা রবার চাষের প্রচলন ঘটে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের পুজিগত আর্থিক অবস্থার ফলাফলই বাগান কৃষি পদ্ধতির উদ্ভব ও এর মধ্যেই তার মূল উদ্দেশ্য নিহিত।

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. বাগান কৃষি পদ্ধতিটি খুবই আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক সম্মত, যাতে বিশেষ শস্যের বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা জড়িত।
২. একটি একক শস্যের বিশেষীকরণ এ কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে সংস্পৃক্ত। যেমন, ভারত ও বাংলাদেশের চা, মালয়েশিয়ার রবার চাষ।
৩. সমগ্র প্রকৌশলগত দক্ষতা, যন্ত্রপাতি, ভৌত অবকাঠামোগত দ্রব্যাদি বিদেশ থেকে বিশেষ করে উদ্যোক্তাদের দেশ থেকে সংগৃহীত এ কৃষি পদ্ধতিতে প্রচলিত।
৪. বাগান কৃষি সাধারণতঃ শ্রমিক প্রগাঢ় কর্মকান্ড। সুলভে বহু সংখ্যক শ্রমিক দেশের পিছনমুখী এলাকা অবস্থা দূরদেশ থেকে আনার প্রবণতা এ কৃষি পদ্ধতিতে পরিলক্ষিত।
৫. শ্রমলব্ধ শ্রমিক ব্যতীত বাকী সকল ধরণের উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী সাধারণতঃ দেশের বহিরাগতদের নিয়োগ দেরী হয়।
৬. চা, কফি, রাবার, কলা, আনারস, কোকোয়া, ইক্ষু, ইত্যাদি বাগান কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়।
৭. যেহেতু বাগান কৃষির প্রায় সকল ফসলই আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী করা হয়ে থাকে, সেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্যাকিং ও প্রসেসিং ইত্যাদির জন্য বন্দর নিকটবর্তী অঞ্চলে এ কৃষি পদ্ধতি অবস্থিত।
৮. বাগান কৃষি পৃথিবীর মধ্যে মূলধন নিবিড় কৃষি পদ্ধতি। যাতে প্রতিষ্ঠা খরচ, বাড়তিসহ রাহা খরচ, শস্য পরিবহণ ও রপ্তানী ইত্যাদি নিমিত্তে বৃহৎ অংকের মূলধনের প্রয়োজন।
৯. বাগান কৃষি মূলতঃ অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এ ক্ষেত্রে উন্নয়নগামী দেশসমূহের এ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে।
১০. বাগান কৃষি সাধারণতঃ দুর্গম এলাকায় গড়ে ওঠে যেখানে খামার আয়তন বিশাল ও বৃহদায়তনের স্থানীয় লোকসংখ্যার ঘনত্ব স্বল্প, জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এর সঙ্গে অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।
১১. বাগান কৃষির উৎপাদিত শস্যাদি মূলতঃ রপ্তানী করে থাকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ আর আমদানীসহ ব্যবহার মূলতঃ উন্নত দেশসমূহ যা তাদের নিজেদের ভোগ্যপন্য অথবা অন্য শিল্পের প্রাথমিক কাচামাল রূপে।

১২. বাগান কৃষি প্রায়ই অন্যদেশ থেকে শ্রমিক অভিপ্রয়ানের উৎসাহ ভিত্তিক কর্মকান্ড যেখানে উপনিবেশকালে হাজার হাজার লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতো সহজ উপায়ে কাজের যোগান প্রাপ্যতার নিমিত্তে ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ঘটতো সুযোগ থাকতো।
১৩. প্রাথমিক প্রাপ্যতার আশা এ কৃষিতে খুবই কম কেননা শস্যের পরিপক্কতা আসতে বেশ সময় লেগে যায়। তবে প্রাথমিকভাবে উচ্চ বিনিয়োগ সত্বেও রাহা খরচা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।
১৪. এ ধরণের কৃষিতে যেহেতু বাহির থেকে শ্রমিক (আসামে সাওতাল) তামিল (শ্রীলংকা) আমদানী করা হয় সেহেতু নানান ধরণের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে।
১৫. যেহেতু এ কৃষি পদ্ধতি ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রচলিত সুতরাং এখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর কারণে নানান ধরণের কীট পতঙ্গ, ভাইরাস ও অন্যান্য রোগব্যাধির বিস্তার ঘটতে দেখা যায়।

সুবিধাবলী

১. উদ্যোক্তারা মৃতপ্রায় অথবা অনুন্নত খাতে বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চারিত করে এ কৃষি পদ্ধতিকে স্পন্দমান, গতিশীল অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে।
২. বাগান কৃষির উৎপাদিত পণ্যাদি সামগ্রীকভাবেই আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যের সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি ঘটার মাধ্যমে সমস্ত পদ্ধতিটিকেই ঝুকির সম্মুখীন করতে পারে।
৩. যেহেতু এটি সামগ্রীকভাবে রপ্তানীমুখী পদ্ধতি, সুতরাং নীট পরিমাণ ও মূল্য জাতীয় রপ্তানীতে প্রবৃদ্ধি ঘটায়। ফলে জাতীয় অর্থের সঙ্গে মূল্যবান বিদেশী অর্থের ও বৃদ্ধি ঘটে।
৪. ইহা একক একটি পদ্ধতি যা হাজার হাজার শ্রমিকের কাজের সংস্থানের মাধ্যমে উদ্ভুত বেকারত্ব সমস্যা হ্রাস করণে বেশ সহায়তা করেছে।
৫. বাগান কৃষি একটি জটিল ধরণের প্রক্রিয়া যা মূলতঃ শিল্প স্থাপন সহ সাধারণ সুবিধাদির মাধ্যমে (যেমন রাস্তাঘাট, আবাসন প্রকল্প, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রাথমিক প্রশাসনিক প্রকল্প ইত্যাদি) নগরায়ন হারকে গতিশীল করে থাকে।

অসুবিধাবলী

বাগান কৃষি পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা ছাড়াও অনেক সময় ইহা আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকে, যেমন-

১. ইহা বহিরাগতদের দ্বারা গড়ে উঠছে এবং তা অবিরামভাবে। সুতরাং এ ধরণের কৃষি পদ্ধতিতে বহুকাল ব্যাপী স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য টেকসই নয়।
২. ইহা শুধু এক ধরণের শস্য উৎপাদন করে বাইরের বাজারে বিক্রী করে থাকে। সুতরাং ইহা স্থানীয় লোকজনের খাদ্য ঘাটতি পুরণে সক্ষম নয়।
৩. মুনাফা নামে বিদেশীদের হাতে অর্থের প্রস্থান ঘটে যা কোনভাবে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সক্ষম নয়।
৪. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সুলভ শ্রমিক বাহির থেকে সংগৃহীত এবং দক্ষ কৌশলীবৃন্দ আরো দূরবর্তী ভূমি থেকে আসে। তাই এ পদ্ধতি স্থানীয় বেকারত্ব ঘুচাতে অক্ষম এবং অনেক সময় সামাজিক উত্তেজনার বিস্তার ঘটে। মৃত্তিকা সন্তানগুলো তখন অহেতুক বহিরাগতদের সঙ্গে অথবা কলহে লিপ্ত হয়।
৫. কৃষি সম্প্রসারণের নামে ভূমি দখল করে ভূমিহীন, পরগাছা ধরণের লোকসমাজ সৃষ্টি করে থাকে।
৬. এ কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য অনুপযোগী। কেননা বেশী করে উৎপাদনও শস্যাবর্তনের অভাবে মৃত্তিকার উর্বরতা কমে যায় ও মৃত্তিকা ক্ষয়রোধ বৃদ্ধি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।
২. ভূমির প্রাপ্যতার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে কৃষির বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. বাগান কৃষি ও স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রগাঢ় কৃষির বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

ক) কৃষি একটি _____ ধরণের আর্থনৈতিক _____।
খ) কৃষির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বিভিন্ন _____ যেমন ভূমি, _____ ঋতুভেদ, _____ উৎপাদন ব্যবস্থা, _____ ইত্যাদি সংস্পৃক্ত।
গ) প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতি _____ তাপমাত্রার কম _____ বজায় থাকে।
ঘ) এ কৃষি _____ অঞ্চলে _____ প্রধান উৎপন্ন শস্য।
ঙ) এ অঞ্চল পৃথিবীর _____ বসতিপূর্ণ _____।
চ) সত্যি বলতে কি _____ সবগুলো _____ উৎপত্তি এ কৃষি পদ্ধতি অঞ্চলে _____ লাভ করেছে।
ছ) শুষ্ক ও অনুর্বর _____ ব্যাপক _____ পদ্ধতি উপযোগী।
জ) এটি একটি আশ্চর্যজনক _____ যাকে খাদ্য শস্য উৎপাদন ও _____ উভয়ই একই সাথে পরিচালিত হয়।
ঝ) সুতরাং মিশ্র _____ পদ্ধতি সুবিধাজনকভাবে _____ পর্যায়ের।
ঞ) মিশ্র _____ পদ্ধতিতে খামারের _____ সাধারণতঃ বড় ধরনের।
ট) এই পদ্ধতিতে ভূমির _____ ও সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণভার _____।
ঠ) এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত _____ ফসলই তাদের নিজেদের ক্ষুধা/ _____ মেটায়।
ড) গোষ্ঠী _____ এ কৃষি _____ অন্যতম _____।
ঢ) গ্রাম বেষ্টিত _____ স্থায়ী ভিত্তিক এ ধরণের প্রচলন যাতে _____ ধরণের কৃষির ____বিদ্যমান।
ণ) শীতকালীন _____ রবি কৃষি নামে _____ ।
ত) কৃষকদের _____ উদ্দেশ্যে হচ্ছে _____ বৃষ্টির পানির ধরে রাখ।
থ) সুতরাং ভূমিরূপ, _____ ইত্যাদি _____ কৌশল অবলম্বনের সুযোগ এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান।
দ) বাগান _____ ক্রান্তীয় _____ মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উত্তর.

ক. জটিল, কর্মকান্ড	খ. নিয়ামক, আর্দ্রতা, জলবায়ু, আঞ্চলিক, তারতম্য	গ. অঞ্চলে, সমন্বয়
ঘ. পদ্ধতি, ধান	ঙ. আদিমতম, এলাকা	চ. পৃথিবীর, ধর্মের, বিকাশ
ছ. জমিতে, কৃষি	জ. মিশ্রণ, পশুচারণ	ঝ. কৃষি, প্রান্তিক
ঞ. কৃষি, আকার	ট. মালিকানা, রাষ্ট্রের	ঠ. সমস্ত, চাহিদা
ড. জীবন, পদ্ধতির, বৈশিষ্ট্য	ঢ. এলাকায়, কৃষির, স্থানান্তর, বৈশিষ্ট্য	ণ. কৃষিই, পরিচিত
ত. মূখ্য, দুস্প্রাপ্য	থ. মূলধন, প্রযুক্তিগত	দ. কৃষি, অঞ্চলের

সত্য হলে স লিখুন, মিথ্যা হলে মি লিখুন।

ক) প্রচুর বৃষ্টির কারণে মৃত্তিকা ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।
খ) বাগান কৃষি পৃথিবীর মধ্যে মূলধন নিবড়ি কৃষি পদ্ধতি।
গ) বাগান কৃষি পদ্ধতি কৃষি সম্প্রসারণের নামে ভূমি দখল করে ভূমিহীন, পরগাছা ধরণের লোকসমাজ সৃষ্টি করে থাকে।
ঘ) কৃষি একটি জটিল ধরণের আর্থনৈতিক কর্মকান্ড নয়।
ঙ) পৃথিবীর প্রায় ৬ বিলিয়ন লোকের মম্যে প্রায় ১/৩ শ প্রগাঢ় কৃষি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।
চ) প্রগাঢ় কৃষি অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে দূর্ভিক্ষ প্রবণ অঞ্চল।
ছ) বহুত্ব কৃষি হচ্ছে বহু শস্য বিন্যাস কৃষি পদ্ধতি।

উত্তর

ক. স খ. স গ. স ঘ. মি ঙ. স চ. স ছ. স

পাঠ- ৪.৪ ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষ ঃ উৎপাদন, বন্টন, সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ধান চাষ ও তার অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ধান উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- বন্টন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন;

ধান চাষ ঃ এ কথা আমাদের সবারই জানা যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান একটি প্রধান খাদ্যশস্য এবং বর্তমান পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি লোক ধানের (চাউল) উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। ইহা একটি প্রাচীন কৃষিজ পণ্য যার উপরস্থ আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে চাউল বের করা হয় এবং এ চাউলই আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য।

ধান চাষের অনুকূল পরিবেশ ঃ বিভিন্ন ভূ-জলবায়ুজ অবস্থায় ধান চাষ হলেও এর নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহকে আদর্শ হিসেবে ধরা যেতে পারে, যেমন-

১. মোটের উপর ধান চাষের আদর্শ অনুকূল অবস্থা হচ্ছে প্রচুর সূর্যালোক ও আর্দ্র মৃত্তিকাসহ মাঝারি থেকে উচ্চ তাপমাত্রা যা ২০-২৭ সেঃ এর মধ্যে ওঠানামা করে। তবে ১৫° সে এর নীচে গেলে ধানের বীজের কোন অংকুরোদগম হতে পারে না।
২. ধান মূলতঃ বৃষ্টি পছন্দ উদ্ভিদ। তাই এ উদ্ভিদের আদর্শ অনুকূল অবস্থা হচ্ছে বাৎসরিক ১৭৫-৩০০ সে মি বৃষ্টিপাত আর শস্য পাকার প্রথম দিকে জলাবদ্ধতা অবস্থা যা উদ্ভিদের ত্বরিত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।
৩. সমতল ভূমি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী, তবে নদী উপত্যাকা, প্লাবন সমভূমি ও কম ঢাল বিশিষ্ট ভূ-ভাগেও প্রচুর ধান চাষ হয়ে থাকে।
৪. উর্বর নদী বিধৌত পলল মৃত্তিকা ধান চাষের সবচেয়ে অনুকূল বিশেষ করে মৌসুমী ভূমির কাদা মিশ্রিত দোআশ মৃত্তিকা, কেন না এ ধরণের মৃত্তিকার পানি ধরে রাখার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি যা ধান চাষের জন্য একান্ত অপরিহার্য।
৫. ধান চাষ একটি ব্যাপক শ্রমনির্ভর কর্মকান্ড। সুতরাং ভূমির শুরু থেকে ঘরে তোলার পুর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ধান রোপন বা বপন, স্থানান্তর, তত্ত্বাবধান, নিড়ানী, শস্য কর্তন, উত্তোলন, মাড়াই ইত্যাদি ধরণের কাজের নিমিত্তে প্রচুর অথচ সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত শর্তাবলী নিম্ন বা জলাভূমি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী এবং উন্নয়ন বিশ্বের প্রায় ৯৫% এলাকা এ ধরনের। আবার অরণ্য সংকুল পাহাড়ী অঞ্চল বিশেষ করে মালয়েশিয়া, আফ্রিকাতে পাহাড়ী বা উচ্চ ভূমিতে ধান চাষাবাদ হয়ে থাকে তবে তা খুবই কম। তাছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ডে ঋতুভিত্তিক যেমন আমন, আউশ, ও বোরা জাতীয় ধান চাষ হয়ে থাকে।

সুতরাং উপরোক্ত পরিবেশ ছাড়াও মূলধন, বাজার, পরিবহণ ব্যবস্থা, ভাল ও উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি আর্থনৈতিক উপাদান; ট্রাক্টর;, থ্রেসার, প্রয়োজনে পানি সেচ, গুদামজাতকরণ, ধান প্রসারে গবেষণা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানবিক উপাদান ধান চাষের অনুকূল পরিবেশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

ধান উৎপাদন ঃ ধান মূলতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্ত্রীয় মৌসুমী বায়ু সেবিত অঞ্চলের ফসল হলেও পৃথিবীর সর্বত্রই এর চাষ পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে। সম্মিলিতভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৯০% ধান উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং প্রায় ১২০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়ে থাকে (চিত্র ১)। নিম্নের সারণীতে ১৯৯৬ সালের উন্নয়ন বিশ্বের ধান চাষে নিয়োজিত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ দেয়া হলোঃ

সারণী ৪.১ ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষ ও উৎপাদন ১৯৯৬ ও ২০০৩

নাম	ধানচাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ মিলিয়ন হেক্টরে	উৎপাদন মিলিয়ন মেঃ টন	উৎপাদন হেক্টর প্রতি
চীন	৩১.৪	১৬৭.৬	৬০৫০
ভারত	৪২.৫	১৩৩.৬	২৯৫০
ইন্দোনেশিয়া	১১.৩	৫১.৮	৪৫০০
বাংলাদেশ	১০.৬	৩৮.১	২৫০০
ভিয়েতনাম	৭.৩	৩৪.৮	৩৭০০
থাইল্যান্ড	৬.৫	২৭.০	৩০০০

নাম	ধানচাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ মিলিয়ন হেক্টরে	উৎপাদন মিলিয়ন মেঃ টন	উৎপাদন হেক্টর প্রতি
ব্রাজিল		৯০.২	
দক্ষিণ কোরিয়া		৬০.৬	
মায়ানমার		২১.৯	
ফিলিপাইন		১৩.২	
জাপান		৯.৯	
যুক্তরাষ্ট্র		৯.০	
উত্তর কোরিয়া		২.৩	
বিশ্ব	১০৯.৬	৪৪৩.৫	৩৮০০

উৎসঃ FAO, Year Book

চিত্র ৪.১ ঃ বিশ্বের ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন করে থকে চীন, যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩৫%। ভারতের স্থান দ্বিতীয়, সে প্রায় ২০% ধান উৎপন্ন করে থাকে। এর পরে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, জাপান, ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, ফিলিপাইন ও কোরিয়ার স্থান (চিত্র- ৪.১)।

পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী বলয় হিসেবে যে তিনটি অঞ্চলে (১) মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রিত এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবহুল দেশসমূহ, যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, চীন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া দ্বীপদ্বয় ইত্যাদি; (২) মৌসুমী বায়ু সেবিত এশিয়ার অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশসমূহ, যেমন মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ফরমেজা, ফিলিপাইন্স ইত্যাদি এবং (৩) এশিয়া ব্যতীত বাকী দুনিয়ার দেশসমূহ যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, জার্মানী ইত্যাদি বিভক্ত করা যায়, তার মধ্যে এশিয়া তথা মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ সিংহভাগ দখল করে আছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেশভিত্তিক আলোচনা করা হলো-

চীন ঃ চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বছরের পর বছর ধরে পরিচিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ ধান উৎপাদনে চীন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চীন একটি চিরায়ত ধান উৎপানকারী দেশ এবং এদেশের ধান শস্যের প্রগাঢ়তা সত্যি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক। উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ হচ্ছে ছিচুয়ান অঞ্চল, নিম্ন ইয়াংসি অববাহিকা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, কুয়ানতাং অঞ্চল এবং ছিতুয়ান হুনান অঞ্চল ইত্যাদি। ছিতুয়ান হুনান অঞ্চল ধান্যধার বা ধানের আধার হিসেবে খ্যাত। এখানে উল্লেখ্য যে, হেকটর প্রতি উৎপাদনেও চীন সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দখল করে আছে।

ভারত ঃ ভারত খুবই ধান চাষের উপর নির্ভরশীল এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে অবস্থান করছে। এদেশবাসীর অনেকেরই প্রধান খাদ্যশস্য ধান, তাই ধান চাষের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের সর্বত্র ধান চাষের প্রবণতা থাকলেও গাঙ্গেয়-ব্রক্ষপুত্র উপত্যাকা ও উপকূল এলাকায় বিপুল পরিমাণে ধানের চাষ হয়ে থাকে। অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, তামিলনাড়ু ও উড়িষ্যাতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে বহু শস্য পদ্ধতির কৃষির প্রচলন রয়েছে পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কারনাটক, ও আসাম রাজ্যসমূহে। তবে ধান উৎপাদনের হেক্টর প্রতি এখনও অনেক কম বিদ্যমান।

ইন্দোনেশিয়া ঃ পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম দেশ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এবং দ্বীপময় দেশটির বহু দ্বীপে বিশেষ করে জাভা, সুমাত্রাও বোর্নিও দ্বীপের আগ্নেয় ও পলিযুক্ত মৃত্তিকা ধান চাষের খুবই উপযোগী। তাছাড়া বোর্নিও, সুমাত্রা ও সেলিবিস দ্বীপভূমির পবর্তঢালে পার্নিসেচের মাধ্যমেও বেশ ধান চাষ হয়ে থাকে। ইন্দোনেশিয়া হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনে বেশ উন্নত অর্থাৎ ২য় অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশঃ ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর স্থান চতুর্থ। অধিক বৃষ্টিপাত, উর্বর পললভূমি ও সুলভ সস্তা শ্রমিক ধান চাষের বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা বাদে দেশের সর্বত্রই বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবিরাম বন্যা, মৌসুমীর জুয়াখেলা মূলধানের অপ্রার্যুতা এবং কৃষিজ সন্তরনের অভাব ইত্যাদির কারণে এ দেশের উৎপাদনের হার হেক্টর প্রতি অনেক কম।

অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহ ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষির-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী বায়ু সেমিত দেশসমূহ একত্রে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি ধান উৎপন্ন করে এবং বর্ণিত উপরোক্ত দেশগুলো ব্যতীত মায়ানমারের ইরাবতী প্লাবন সমতল ভূমি, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের মেকং মেনাম উর্বর পললভূমি; ভিয়েতনাম ও লাওসের রেড অববাহিকাসহ ফিলিপাইনস হচ্ছে চিরাযত ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। থাইল্যান্ড ও মায়ানমার পৃথিবীর ধান রপ্তানী কারকও বটে কেননা এদেরকে এশিয়ার ধানের আধার বলা হয়ে থাকে। পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও জাপানে বেশ ধান উৎপন্ন হয়।

উপরোক্ত দেশগুলো ব্যতীত ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি ধান চাষের জন্য পরিচিত। ব্রাজিল ধান উৎপাদনের প্রায় ২.৫% এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১% ধান উৎপন্ন করে থাকে। ইতালীর পো উপত্যাকা, ফ্রান্সের রোন উপত্যকা মিশরের নীল উপত্যাকা ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

ধান বন্টন সমস্যা ঃ উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ধান চাষ বিশ্বব্যাপী, তবে বন্টন ব্যাপারে নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি সমস্যা চিহ্নিত করা হলোঃ যেমন-

১) ধান বিশ্বের সার্বজনীন ফসল হিসাবে স্বীকৃতি না পেয়ে উন্নয়নশীল/এশিয়ার মৌসুমী বায়ু সেবিত অঞ্চলের লোকজনের প্রধান খাদ্য শস্য হিসেবে পরিচিত।

২) ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীন এখনও শীর্ষে এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সে উপরে। অথচ ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ভারতের চেয়েও কম। আবার ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ভারত শীর্ষে কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হার ৫ম স্থানে অবস্থিত। অপর পক্ষে উন্নত বিশ্বে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী প্রমুখ দেশে ধান চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ কম হলেও উৎপাদনের হার অনেক অনেক বেশি।

৩) ভূ-প্রকৃতিগত, জলবায়ুগত ও নদী বিন্যাসগত পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর সর্বত্র ধান চাষ হলেও মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নদীবিধৌত পলল ও প্লাবন সমভূমি বদ্বীপ ভূমি ও উপকূল বেষ্টিত উর্বর ভূমিতে ব্যাপক ধান চাষ হয়ে থাকে। অপরদিকে মরুভূমি, পাহাড়ী ও অসমতলভূমি ধান চাষের অনুপযোগী।

৪) ধান চাষ মূলতঃ আর্দ্র, পলি, মৃত্তিকা বৃষ্টিবহুল স্থানে ব্যাপক ভাবে হয়ে থাকে। অপরদিকে শুষ্ক বৃষ্টিহীন অঞ্চল ধান চাষের খুব উপযোগী নয়।

৫) উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষ মূলতঃ জীবিকা নির্বাহ ভিত্তিক এবং উৎপাদিত শস্য সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতে অনেক সময় সক্ষম হয়ে উঠে না। তাই উদ্ধৃত্ব কোন শস্য আন্তর্জাতিক বাজারে যেতে পারে না বা গেলেও খুবই সীমিত

আকারে। অথচ পাশ্চাত্যের দেশসমূহে সীমিত ধান চাষ হলেও অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম, বিধায় ব্যাপক হারে উৎপাদিত শস্য আন্তর্জাতিক বাজারে যেতে পারে এবং আমদানী রপ্তানী মূলতঃ তাদের হাতেই।

৬) উন্নয়নশীল বিশ্ব খুবই জনবহুল এলাকা। অধিকাংশ ধান চাষীরা নিরক্ষর, দরিদ্র এবং সমাজে উত্তরাধিকার সূত্র বহাল থাকার কারণে স্বল্প জমিজমা খন্ড বিখন্ড পরিলক্ষিত হয়। ফলে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কৌশল যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত বীজ, সেচ, রাসায়নিক সার ইত্যাদির প্রয়োগের পরিবর্তে মামুলী গরু, লাঙ্গল পদ্ধতি অবলম্বনে চাষাবাদ করে থাকে। ফলে প্রতিযোগিতার মুখে তারা ব্যর্থ হয় এবং উৎপাদনের হারও কম হয়।

৭) উন্নয়নশীল বিশ্বের ধান চাষীরা মূলতঃ মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সেহেতু সময়মত বৃষ্টি না হলে, অনেক সময় অতি বৃষ্টি হলে অথবা না হলে অজন্মা, বন্যা বা খরা ইত্যাদি ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, ফলস্বরূপ ধান চাষীরা আরো গরীব হয়ে যায়।

সমাধানঃ উপরোক্ত সমস্যাবলী নিম্নভাবে সমাধান করা যেতে পারে, যেমন-

১) মৌসুমী বৃষ্টি বা প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীল না হয়ে প্রয়োজনের সময় গভীর নলকূপ, সরু নলকূপ, পুকুর, খাল, বিল, নদী বা নালা থেকে পানি সেচনের মাধ্যমে চাষাবাদ করা যেতে পারে। তাতে খরা, অজন্মা, বা স্বল্প উৎপাদনের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে।

২) ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহ মূলতঃ ধান আমদানীকারকও। কেননা অধিক লোক বসতির ও অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে নিজেদের উৎপাদিত শস্য দ্বারা সংকুলান না হওয়ায় আমদানী করতে হয়। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে এদের শস্য যেতে পারে না বলে এদের গুরুত্ব খুবই সীমিত। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে ধানের বিকল্প শস্যকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবেই ধানের উপর চাপ কমবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের অংশগ্রহণ ব্যাপক তথা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ধান চাষের অনুকূল পরিবেশ উল্লেখ করুন।

২. ধান উৎপাদন কারী দেশসমূহ মূলতঃ ধান আমদানী কারক- ব্যাখ্যা করুন।

৩. ধান চাষ নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক পরিবেশ উল্লেখ করুন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান একটি _____।

২. ইহা একটি কৃষিজ _____ যার উপরস্থ _____ উন্মোচনের মাধ্যমে _____ বের করা হয়।

৩. ধান মূলতঃ বৃষ্টি পছন্দ _____।

৪. ধান চাষ একটি ব্যাপক _____ কর্মকান্ড।

৫. বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন করে থাকে _____।

৬. ধান চাষ বিশ্বব্যাপী, তবে বন্টন ব্যাপারে নানাবিধ _____ পরিলক্ষিত।

৭. ধান চাষ মূলতঃ আর্দ্র, পলি, মৃত্তিকাবহুল স্থানে _____ ভাবে হয়ে থাকে।

৮. উন্নয়নশীল বিশ্বে ধান চাষ মূলতঃ জীবিকা _____ ভিত্তিক।

উত্তরঃ

১. প্রধান, খাদ্যশস্য,	২. পণ্য, আবরণ, চাউল,	৩. উদ্ভিদ,	৪. শ্রমনির্ভর
৫. চীন,	৬. সমস্যা,	৭. ব্যাপক	৮. নির্বাহ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। বিশ্বের ধান উৎপাদন ও বণ্টন আলোচনা করুন।

পাঠ- ৪.৫ ঃ উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ চাষঃ উৎপাদন, বণ্টন সমস্যা ও সমাধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ আখ চাষ ও অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ☞ আখ উৎপাদন সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ☞ বণ্টন সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

আখ চাষ ও অনুকূল পরিবেশ

আখ উদ্ভিদ জাতীয় বর্ষজীবী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থকরী ফসল। ইহা চীন ও ভারতের দেশজ ফসল। আখের বাণিজ্যিক ভাবে বাগান চাষের সূচনা হয় পর্তুগীজ উপনেবিশদের দ্বারা সর্ব প্রথম ব্রাজিলে। পরবর্তীতে কিউবা, মেক্সিকো এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে। বর্তমানে আখ একটি বাণিজ্যিক শস্য এবং ইহার দ্বারা গুড়, চিনি, সুরাসার, সার, ও ঔষধ উৎপাদন, জ্বালানী, গরু খাদ্য, কাগজ, কাগজ মন্ড, কাগজ বোর্ড, ও কার্ড বোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

অনুকূল পরিবেশঃ আখ চাষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিম্নে এসব উপাদান উল্লেখ করা হলোঃ

১) আখ মূলতঃ ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় শস্য। সুতরাং ইহা সাধারণতঃ গরম, আর্দ্র-জলবায়ু পছন্দ করে। বার্ষিক গড়ে ২১-২৭ সে তাপমাত্রা আখ চাষের জন্য প্রয়োজন। তবে এর নীচের তাপমাত্রা আখ চাষের জন্য ক্ষতিকর। উজ্জল সূর্যকিরণ আখের সুক্রোজ গঠন সহায়তা করে থাকে।

২) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০০-১৭৫ সেমি আখ চাষের জন্য প্রয়োজন এবং এটিই আখ চাষের আদর্শ অবস্থা। অতিরিক্ত বৃষ্টি আখের গ্লুকোজ গঠনে তৎপর হতে পারে না।

৩) ক্ষারীয়, উর্বর, উত্তম-পানি নিস্কাশন যুক্ত দোআঁশ মৃত্তিকা আখ চাষের খুবই উপযোগী। তবে চুন ও পটাশ মিশ্রিত লোনা মৃত্তিকা ও লাভাসহ কৃষ মৃত্তিকা আখ চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

৪) জলাবদ্ধতা আখ চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই সমতল ভূমিও সামান্য ঢাল যুক্ত সমতল ভূমি আখ চাষের জন্য উপকারী।

৫) তাছাড়া আখ চাষের জন্য সুলভ অথচ প্রচুর শ্রমিক, প্রচুর মূলধন, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বাজারজাতকরণ খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান।

উন্নয়নশীল বিশ্বে আখ উৎপাদনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আখ মূলতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় শস্য যা উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। সুতরাং আখ চাষ ৩০° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ (সারণী ১ ও চিত্র ১)।

সারণী- ৪.১ ঃ আখ চাষের উৎপাদন (১৯৯৬)

দেশ	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	মোট উৎপাদন % হিসেবে	চাষে নিয়োজিত জমি (মিলিয়ন হেক্টর)
ব্রাজিল	৩২৪	২৭	৪.৮
ভারত	২৫৫	২১	৩.৯
থাইল্যান্ড	৬২.৪	৫	১.১
চীন	৫৫.৬	৪৭	১.০৫
মেক্সিকো	৪৭	৪	১
কিওবা	৪০	৩০৪	১.৫
বিশ্ব	১২০০		

উৎসঃ ফাও বুলেটিন, ১৯৯৬।

চিত্র ৪.২ ঃ বিশ্বের আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

সারণী ১ ও চিত্র ৪.২ পর্যালোচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশসমূহের দেশগুলো সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৮০% এরও বেশি আখ উৎপন্ন করে থাকে এবং প্রধান প্রধান আখ উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে ব্রাজিল, ভারত, থাইল্যান্ড, চীন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার এটাও লক্ষণীয় যে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো একত্রে ৩০% ভাগেরও বেশি আখ উৎপাদন করে এবং আখ চাষের অন্তর্গত জমির পরিমাণ প্রায় ৫০%। সুতরাং আখ চাষ ও উৎপাদন উভয় উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে থাকে। নিচে আখ উৎপাদনকারী দেশসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ব্রাজিলঃ আখ উৎপাদনে ব্রাজিলের স্থান ১ম এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে সে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ২৭% উৎপাদন, প্রায় ৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আখ চাষ করেছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্তুগীজরা ব্রাজিলে ১ম আখ চাষের সূচনা করেছিল কেননা সেখানকার উষ্ণ, আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ুর সঙ্গে লাভাযুক্ত কৃষ মৃত্তিকা ও সুলভ শ্রমিক আখ চাষের উপযোগী ছিল এবং বর্তমানে তারা আখচাষে পৃথিবীর অন্যতম দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ব্রাজিলের মোটামুটি তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে মেনাস গেরাইস পেরচ্ছামবাকুর উপকূলীয় অঞ্চল, আলাগোয়াস, পারাহিমা এবং বাহিকা; রিওডি জানিবোর উপকূল এলাকা আখ চাষের জন্য বিখ্যাত। ব্রাজিলে আখ চাষের নিয়ন্ত্রণে জমির পরিমাণ বাড়ার দিকে রয়েছে এবং সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে এর উৎপাদন বেশ ব্যাপক হবে বলে আশা করা যায়।

ভারত ঃ আখ উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে, যার ১৯৯৬ সালে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫৫ মিলিয়ন টন এবং শতকরা হিসেবে প্রায় ২১%। ইহা ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যাকায় বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সমভূমি, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে ভারত আখ চিনি উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, যদিও ইহা উৎপাদনে দ্বিতীয়।

চীন ঃ আখ ও আখ চিনি উৎপাদনে চীন বিশ্বে ৪র্থ স্থানে এবং ১৯৯৬ সালে প্রায় ৫৫.৬ মিলিয়ন টন আখের চাষ করেছিল যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫%। আখ চাষে চীনের দক্ষির-পূর্বাংশ যা মৌসুমী বায়ু দ্বারা সেবিত অঞ্চল বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে ফুকিয়েন, হুনান কিয়ানগু স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে আখের চাষ হয়ে থাকে।

কিউবা ঃ আখ চাষে কিউবার স্থান ৬ষ্ঠ এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ৩.৪ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করে থাকে। আর চিনি রপ্তানীতে কিউবা প্রথম স্থান দখল করে আছে। কিউবার অর্থনীতিতে আখের ভূমিকা বেশ ব্যাপক। কিউবার উল্লেখযোগ্য খামারগুলো হচ্ছে হাভানা, মাতানজা, অরিয়েন্টা, ক্যামাগুয়ে ও সান্তা ক্লারা জেলা।

থাইল্যান্ডঃ আখ চাষে থাইল্যান্ড তৃতীয় যার ১৯৯৬ সালে বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫%, পরিমাণ ছিল ৬২.৪ মিলিয়ন টন। তাছাড়া আখ চাষের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলো হচ্ছে মেক্সিকো, হাওয়াই, কানাই, আমেরিকারর চলমান মুভি রাপ, অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, ফিজিও নেপালে প্রচুর আখ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বণ্টন সমস্যাঃ পূর্বের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে, আখ চাষ ও উৎপাদনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। বণ্টন ব্যাপারে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকাগত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আখ চাষ ও উৎপাদনে বিদ্যমান। অর্থাৎ সামান্য ঢাল বিশিষ্ট সমতল ভূমি ৩০° উঃ- ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থান, ক্ষারীয়, উত্তম পানি নিষ্কাশন যুক্ত লাভা ও দোআশ মৃত্তিকা, ২১-২৭ সেঃ তাপমাত্রা এবং ১০০-১৭৫ সেমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং ইহা ক্রান্তীয় ও উপক্রানীয় অঞ্চলে উপস্থিত যা আখ চাষ ও উৎপাদন কার্যক্রমকে সীমায়িত করেছে এবং এর একটু ব্যতিক্রমে আখ চাষ ও উৎপাদনে বেশ ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। প্রকারান্তরে আখের বিকল্প হিসেবে বীটের আবির্ভাব এবং আখ চাষকে আরো সীমায়িত করতে বাধ্য করছে।
২. আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোর মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করলেও আখ চাষে নিয়োজিত ভূমি, হেক্টর প্রতি উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিম্নমান, পরিলক্ষিত।
৩. আখ মূলতঃ উপনিবেশিকতার ফসল যা বাগান পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয় এবং এর মূল উদ্দেশ্য ব্যবসা বা বাণিজ্য। আমরা জানি বাগান কৃষি পদ্ধতি খুবই উন্নত যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে প্রচুর মূলধন, বিশাল আয়তনের ভূমি, সুলভ অথচ সস্তা শ্রমিক, সুগঠিত যাতায়াত ব্যবস্থা, গুদামজাতসহ উন্নত বাজার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সুন্দর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যা মূলতঃ বহিরাগতদের হাতে বিন্যস্ত। অথচ আখ উৎপাদনকারী দেশগুলো অনুন্নত এবং নানাবিধ সমস্যায় জড়িত। তাই বর্তমানে বিদেশী অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুটিয়ে নিচ্ছে। ফলস্বরূপ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে আখ চাষ ও উৎপাদন।

সমাধান

১. বিদেশী ব্যবস্থাপনা ও পুনঃ অর্থ লগ্নীসহ নানাবিধ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আখ চাষ পুনঃজীবিত করা যেতে পারে।
২. সকল প্রকার অন্তঃকলহ, রাজনীতি, দূর্ণীতি ইত্যাদির উর্ধে আত্মনিবেদিত প্রাণে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৩. ভূ-প্রাকৃতিক বাধা থাকা সত্বেও বিদ্যমান অঞ্চলসমূহে ব্যাপক ভিত্তিতে এর চাষ ও উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. আখ উদ্ভিদ জাতীয় _____ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি _____ ফসল।
২. আখ মূলতঃ _____ ও উপক্রান্তীয় শস্য।
৩. বার্ষিক বৃষ্টিপাত _____ সেঃ মিঃ আখ চাষের জন্য _____।

উত্তর

১. বর্ষজীবী, অর্থকরী ২. ক্রান্তীয় ৩. ১০০-১৭৫ সেঃ মিঃ, প্রয়োজন।

সংক্ষেপে উত্তর দিন

১. আখ চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশের একটি তালিকা দিন।
২. জলাবদ্ধতা আখ চাষের জন্য ক্ষতিকারক- ব্যাখ্যা করুন।
৩. আখ চাষের বন্টন সমস্যাগুলো উল্লেখ করুন।
৪. কিভাবে উদ্ভুত সমস্যা দূরীকরণ সম্ভব উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উন্নয়নশীল বিশ্বের আখ চাষ, উৎপাদন ও বণ্টন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।